দাম : দশ টাকা

কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে কর্ণাটক
পৃঃ - ২৪

স্বস্তিকা

আওরঙ্গজেবকে জাতে তোলার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা শুরু করেছে ছদ্ম সেকুলাররা
পৃঃ - ৪৩

৭০ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা।। ২৮ মে ২০১৮।। ১৩ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

বিজেপিকে ঠেকাতে গরজের জোট

- সবচেয়ে বেশি আসন (১০৪) জিতেও কর্ণাটকে বিজেপি বিরোধী আসনে।
- সবচেয়ে কম আসন (৩৮) জেতা দলের নেতা কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হলেন।
- কর্ণাটকের মানুষের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েও কংগ্রেস অনৈতিকভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে মরিয়া।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৪০ সংখ্যা, ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৮ মে - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কর্ণাটকে আদর্শ-বিরোধী নীতিহীন জোটের অ্যাসিট টেস্ট হচ্ছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : দিদি তুমি কি ফুরিয়ে গেলে ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

রাজ্যপালদের ক্ষমতার সীমারেখা চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে ▯ বৈভব পুরন্দরে ▯ ৮

মুখোঘাসেরা মরে কিন্তু শেষ হয়ে যায় না ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১১

গুজরাট দাঙ্গার খবরের বেশিরভাগ ফেক-নিউজ ▯ নীতীন রায় ▯ ১৩

সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে, তাঁর অবদান নিয়ে দেশবাসীর ভাবনা কতটুকু? ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১৫

বাংলাদেশের ইসলামিকরণে মডেল মসজিদ প্রকল্প ▯ ১৮

বহিঃশত্রুর থেকে ভিতরের ছদ্মবেশী শত্রুরা বেশি বিপজ্জনক ▯ সৌদামিনী চট্টোপাধ্যায় ▯ ২০

পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতার অলিন্দে কংগ্রেস ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২৩

কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে কর্ণাটক ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২৪

ভ্রমণ : গুজরাটের গোন্দালধামে কয়েকদিন ▯ অমিত সাহা ▯ ২৬

পৌরাণিক নগর : কম্বোজ (রাজপুর) ▯ গোপাল চক্রবর্তী ▯ ৩১

শ্রীশ্রী ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের পূর্ণতা প্রাপ্তি ও বিশ্বরূপ প্রদর্শনের শততম বর্ষপূর্তি ▯ শ্রীঅজয় ঘোষ ▯ ৩২

কমলাক্ষ ও জলেশ্বর শিবমন্দির ▯ জলজ বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৩

গল্প : স্নেহের ভিখারি ▯ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ▯ ৩৫

আওরঙ্গজেবকে জাতে তোলার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা শুরু করেছে ছদ্ম সেকুলাররা ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **স্মরণে : ৪০** ▯ **রঙ্গম : ৪১** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
৪শে জুন, '১৮

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৪শে জুন, '১৮

দূষণ

বায়ু থেকে জল, শব্দ থেকে দৃশ্য— সর্বত্রই এখন দূষণ। ওজোন স্তরে ছিদ্র দেখা দেওয়ায় আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাবে বাড়ছে ক্যানসার। দূষণের বিপদ একানেই শেষ নয়। মেট্রো শহরগুলিতে বাড়ছে ফুসফুসের অসুখ। আট থেকে আশি— অনেকেই বাইরে বেরোচ্ছেন নাক-মুখ ঢেকে। অভ্যস্ত হয়ে উঠেচেন ইনহেলারে। ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রেক্ষিতে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার মুখ্য আকর্ষণ দূষণ।

লিখবেন— মোহিত রায় এবং কুণাল চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অশুভ জোট

মাত্র ৩৭টি আসন দখল করিয়া কর্ণাটকে মুখ্যমন্ত্রী হইতেছেন জেডিএস প্রধান এইচ ডি দেবেগৌড়ার পুত্র এইচ ডি কুমারস্বামী। ৭৮ আসনের অধিকারী কংগ্রেস কর্ণাটক বিধানসভায় দ্বিতীয় বৃহৎ দল হইলেও পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া কুমারস্বামীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে স্বীকার করিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া কুমারস্বামী সোজাসুজিই জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি পুরা পাঁচ বছরই জোট সরকারের নেতৃত্ব করিবেন অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী থাকিবেন। কংগ্রেস নেতাদের কপালে ভাঁজ ফেলিবার জন্য কুমারস্বামীর এই বয়ান যথেষ্ট। কেননা অতীতে (২০০৬ সালে) বিজেপিকে রুখিবার জন্য কংগ্রেস ও জেডিএস জোট করিয়া যে সরকার গঠন করিয়াছিল তাহা ২০ মাসের বেশি চলে নাই। তবুও মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে রুখিবার গরজেই দুই দল এই সুবিধাবাদী জোট বাঁধিয়াছে। এই জোট গঠনের পিছনে কোনও রাজনৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করিবার তাগিদ নাই।

ঘটনা হইল, নির্বাচনী প্রচারকালে দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যেভাবে কাদা ছুঁড়িয়াছে, এমনকী জোট গঠনের পরেও, তাহাতে এই দুই দলের জোট কতদিন স্থায়ী হইবে তাহা সন্দেহ উদ্রেক করে। বিশেষত কুমারস্বামীর সরকার কর্ণাটকের উন্নয়ন ও বিকাশে কতটা সহায়ক হইবে—এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। কেননা একেই তো দুই দল পরস্পরের সমালোচনায় মুখর, অধিকন্তু দুই দলের আদর্শ ও নীতির মধ্যে কোনও সাম্য নাই। জেডিএস একটি আঞ্চলিক দল, অন্যদিকে কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় দল। সঙ্গত কারণেই দুই দলের দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা সহজবোধ্য। নির্বাচনের পূর্বে দুই দল যে জোট গঠন করিতে পারে নাই, জোট সরকার গড়িয়া তাহারা রাজ্যের মানুষের মঙ্গল করিতে পারিবে—এই আশা কতটা করিতে পারা যায়?

আমাদের দেশে নির্বাচনের পর জোট গড়িয়া যেসব সরকার গঠিত হইয়াছে, তাহার অভিজ্ঞতা ভালো নহে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদই ছিল এইসব জোট গঠনের ভিত্তি। সরকার গঠন করিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিই তাহাদের কাছে মুখ্য হইয়া উঠে। তাই কুমারস্বামীর সরকার কতদিন চলিবে তাহা লইয়া সন্দেহ থাকিয়াই যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে, পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া যে জেডিএস হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কারণ কুমারস্বামীর সহিত তাহার খাপ খাইত না। সেই তিনি এখন কুমারস্বামীকে নিজের পছন্দ মতো কতটা সরকার চালাইতে দিবেন সেই প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। আরও সন্দেহ হয়, বিজেপি বিরোধিতার নামে কংগ্রেস কর্ণাটকে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আর কী কী করিতে উদ্যোগী হইবে? যদি কর্ণাটকের নূতন সরকার রাজ্যের সমস্যাকে গুরুত্ব না দেয়, তাহা হইলে বিকাশশীল এই রাজ্যটির সামনে আরও সমস্যা বাড়িবে। কর্ণাটকের রাজধানী ব্যাঙ্গালুরু তথ্য ও প্রযুক্তির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরিয়া শহরের ছবি খানিকটা ম্লান। এই দুষ্পরিণাম শুধু ব্যাঙ্গালুরুর জন্য নহে, সারাদেশের পক্ষেও উদ্বেগজনক। কর্ণাটকের মানুষ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বিজেপির পক্ষে রায় দিয়াছেন। এর পরেও কর্ণাটকের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়া কংগ্রেস জেডিএসের সঙ্গে অশুভ জোট করিয়াছে। তাই এই অশুভ জোট কতদিন টিকিবে—এই প্রশ্ন রহিয়াই যায়।

সুভাষিতম্

অন্যস্থানে বৃথা জন্ম নিষ্ফলং চ গতাগতম্।
ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্মদম্।।
ভারতে ক্ষণমাত্র জন্মও সার্থক ও কল্যাণপ্রদ। অন্যত্র জন্ম বৃথা, সেখানে যাতায়াতই নিষ্ফল।

কর্ণাটকে আদর্শ-বিরোধী নীতিহীন জোটের অ্যাসিড টেস্ট হচ্ছে

দেশের সমস্ত সংবাদমাধ্যমের বুথ ফেরত সমীক্ষা আগাম জানিয়েছিল যে, কর্ণাটকের বিধানসভার নির্বাচনের ফল ত্রিশঙ্কু হতে চলেছে। বিজেপি, কংগ্রেস এবং জেডিএস রাজ্যের এই তিন প্রধান দলের কেউই একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। তবে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বিজেপি। সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষা সাধারণভাবে মিলেছে। বিজেপি বৃহত্তম দল হলেও সরকার গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় গরিষ্ঠতা নেই। আর মাত্র আটটি আসন পেলে রাজ্য বিজেপি নেতা বুকানাকেরে সিদ্দালিঙ্গাপ্পা ইয়েদুরাপ্পা কর্ণাটকবাসীদের স্থায়ী সরকার উপহার দিতে পারতেন। তিনি সেই সুযোগ পেলেন না। বিজেপি-বিরোধী দল কংগ্রেস এবং জেডিএস নেতারা উল্লসিত। কারণ, তাঁরা কর্ণাটকে জোট সরকার গঠন করেছেন। তবে বিধানসভায় আস্থা ভোটে জয়ী হতে হবে। একটা প্রশ্ন থেকেই যাবে যে, এই জোট সরকার প্রাথমিকভাবে আস্থা ভোটে জিতলেও সেই আস্থা কতদিন ধরে রাখতে পারবেন জেডিএস নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী এবং রাজ্য কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার। কারণ, রাজ্য রাজনীতিতে এই দুই নেতার আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। এঁদের দুজনকে প্রকাশ্যে বাক্যালাপ করতে দেখা যায়নি। অনেকটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সম্পর্কটা যেমন ছিল। ক্রমাগত বিব্রত করে সেদিন জ্যোতিবাবু বাধ্য করেছিলেন নিপাট ভালোমানুষ অজয়বাবুকে পদত্যাগ করতে। কর্ণাটকে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে অবাক হবেন না।

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই জেনেও ইয়েদুরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন কেন? জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী বলেছেন যে মাথাপিছু একশো কোটি দিয়ে আটজন বিধায়ক কিনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করাই ছিল বিজেপি নেতাদের লক্ষ্য। রাহুলবাবুকে দোষ দিতে

গূঢ় পুরুষের

কলম

পারি না। দুর্নীতি কংগ্রেসের রক্তে, মজ্জায়। টাকা ছড়িয়ে জনপ্রতিনিধি কেনাটাই তাঁর তাই সর্বপ্রথম মনে এসেছে। অথচ রাজনীতিটা সিরিয়াসলি নিলে তিনি খেয়াল করতেন যে, ইয়েদুরাপ্পার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। মোদী এবং শাহ স্পষ্ট নির্দেশ দেন বিরোধী শিবির থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে আনার অনৈতিকতার পরিবর্তে সসম্মানে রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী আসনে বসবে বিজেপি। এতে জনমানসে বিজেপির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। সাধারণ মানুষের আবেগ দলের পক্ষে থাকবে। কিন্তু ইয়েদুরাপ্পার আস্থা ছিল যে, কংগ্রেস-জেডিএস থেকে তিনি বিধায়ক আনতে পারবেন। কারণ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বিধানসভার সদস্যপদে শপথ নেননি তাই দল বদল আইন ভঙ্গ হবে না। তাঁরা বিজেপির প্রতিনিধি হয়েই বিধানসভায় সদস্য হবেন। অথচ অমিত শাহ টেলিফোনে ইয়েদুরাপ্পাকে সতর্ক করেছিলেন যে বিরোধী বিধায়ক ভাঙাতে যেন কোনওভাবেই দেশের আইন লঙ্ঘন না করা হয়। আস্থা ভোটের আগে অমিত শাহ জানতে চান যে প্রয়োজনীয় সংখ্যা না থাকলে ইয়েদুরাপ্পা কী করবেন। ইয়েদুরাপ্পা স্বীকার করেন তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। দলের শীর্ষ নেতা তাঁকে আস্থা ভোটের আগেই পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। বিধায়ক কেনার জল্পনাটা কংগ্রেসের মাঠে মারা গেল। ধোপে টিকল না।

বিজেপির সরে দাঁড়ানোয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লসিত। তাঁর স্বপ্নের ফেডারেল ফ্রন্ট গঠনের এটি প্রথম সিঁড়ির ধাপ। কংগ্রেসকে সঙ্গী করে আঞ্চলিক দলের জোট লোকসভার নির্বাচনে মোদীর অশ্বমেধের ঘোড়া আটকে দিতে পারে বলে দিদি অখিলেশ, মায়াবতী, চন্দ্রবাবুদের বুঝিয়েছেন। কর্ণাটকে বিজেপি বিরোধী শিবিরের নেতারাও সকলে উল্লসিত। তবে এই প্রাথমিক উল্লাস কতদিন স্থায়ী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। কারণ, অতীতেও কংগ্রেস এবং জেডিএসের একাধিকবার জোট হয়েছে। তার অভিজ্ঞতা দুটি দলের ক্ষেত্রেই ভাল নয়। কেন্দ্রে একদা দেবেগৌড়া সরকারের পতনের কারণ ছিল কংগ্রেস। আবার এই কর্ণাটকেই মুখ্যমন্ত্রীর কুরশি দখল করতে কংগ্রেসের হাত ছেড়ে বিজেপির সঙ্গে যান এইচ ডি কুমারস্বামী। পতন হয় কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকারের। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার এই পুত্র অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি দু' নম্বর নন, এক নম্বরে থাকতে চান। সে ক্ষেত্রে নৈতিকতার ধার ধারেন না। নিঃসন্দেহে, কর্ণাটকের ভোট বিজেপি-বিরোধী আদর্শহীন দলের রামধনু জোটের একটা অ্যাসিড টেস্ট। আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জাতীয় দল কংগ্রেসের সমঝোতা কতদিন চলতে পারে সেদিকেই নজর রাখতে হবে। ▮

দিদি তুমি কি ফুরিয়ে গেলে ?

হে তৃণমূলিগণ,

২১ জুলাই। এই তারিখটা বঙ্গ রাজনীতিতে দিদি মমতা-ম্যাজিকের মাপকাঠি। ১৯৯৩-র ২১ জুলাই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস সভানেত্রী। সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েই মৃত্যু হয়েছিল ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীর।

কংগ্রেস নেত্রীর সেই আন্দোলনকে ভোলেননি তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাম জমানায় প্রতিটি ২১ জুলাই বুঝিয়েছে রাজ্যে নতুন শক্তির উদয় হচ্ছে। প্রতি ২১ জুলাই সমর্থকদের উপস্থিতি বৃদ্ধি সিপিএমের শক্ত ভিত একটু একটু করে নরম হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। আর ২০১১ সালে রাজ্যে পরিবর্তন সেই ইঙ্গিতকে সত্যি করেছে।

কারও অস্বীকার করার উপায় নেই তিন দশকের বাম জমানায় ইতি টানার পিছনে যে শক্তি সব থেকে বেশি কাজ করেছিল তার নাম—মমতা-ম্যাজিক।

সেই ম্যাজিকে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশের মোদী-ঝড় থমকে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরের তীরে এসে। সপা, বসপা-র উত্তরপ্রদেশেও পদ্ম পাঁপড়ি মেলেছে সর্বজয়ীর মতো। তার পিছনেও এক ও অদ্বিতীয় কারণ ছিল— মমতা-ম্যাজিক।

এর আগে ২০১৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার ঠিক আগে আগে রাজ্যে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি। সারদা, রোজভ্যালি ইত্যাদি নিয়ে রাজ্য তখন যেন তৃণমূল বিরোধী বারুদের স্তূপ। তার মধ্যেও তৃণমূল থেকেছে তৃণমূলের মতো। যাবতীয় জল্পনা মিথ্যা করে বাংলা দেখেছে— মমতা-ম্যাজিক।

গত বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তো একই চিত্র। বিজেপি তখন থেকেই রাজ্যে নতুন শক্তি হিসেবে শক্তি সঞ্চয় করছে। অন্য দিকে, বাম-কংগ্রেস জোট হয়ে ভোট ভাগ আটকে গিয়েছে। সেই পরিস্থিতিকে আরও প্রতিকূল করে দিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সামনে এসে দাঁড়াল নারদকাণ্ড। এক ডজন নেতামন্ত্রী অভিযুক্ত। না, এবার অভিযোগ শুধু মুখে নয়, ভিডিওতে যা দেখা যায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, নেতারা বান্ডিল-বান্ডিল টাকা নিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার তোয়ালে মুড়ে। কার্যত কোণঠাসা তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা। না, তৃণমূলকে উদ্ধার করতে কোনও ঐশ্বরিক শক্তি লাগেনি। সব কিছুর সমাধান করে দিয়েছিল সেই এক— মমতা- ম্যাজিক।

সেই ম্যাজিক কি আর নেই? নাকি ক্যারিশ্মা কমছে? সেটা না হলে অনুব্রত মণ্ডলকে কেন রাস্তায় নামিয়ে 'উন্নয়ন'-কে দাঁড় করিয়ে রাখতে হলো! মমতা-ম্যাজিক অক্ষুণ্ণ থাকলে কেনই বা মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে 'বিরোধীশূন্য' পুরস্কার ঘোষণা করতে হবে! কেন মনোনয়ন থেকে গণনা প্রতি পর্বে রক্তের বিনিময়ে, প্রাণের বিনিময়ে জয় ছিনিয়ে নিতে হলো? এত উন্নয়নের সাফল্য সত্ত্বেও কেন ৩৪ শতাংশ ভোটহীন জয় পেতে হবে! কেন গর্বের সঙ্গে বলা গেল না, আমরা একশো শতাংশ লড়াই দিয়ে জনতার রায় নিয়েছি! বার বার তাই সেই একই প্রশ্ন— সহজ জয়ের জন্য কি মমতা-ম্যাজিক 'কম পড়িয়াছিল'?

বছর পার করলেই লোকসভা নির্বাচন। তার পরে একটি বছর কাটিয়েই বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্যে বিজেপির শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। এমন সময়ে প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। 'মমতা-ম্যাজিক' থাকতে, এত 'লাঠি-সোটা'-র দরকার কী?

নাকি 'ম্যাজিক' ফুরিয়েছে! আচ্ছা, ফুরিয়ে না যাক, কমেছে কি! এমন সব প্রশ্ন মনে নিয়ে ঘুম আসছে না আমার মতো তৃণমূলপ্রেমীর। আমি যে দিদিকে খুব ভালোবাসি তাই! চোখ-চাওয়া ঘুম যে মানুষের অসাধ্য।

—সুন্দর মৌলিক

রাজ্যপালদের ক্ষমতার সীমারেখা চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে

বৈভব পুরন্দরে

১৯৯৬ সালে মাত্র ৪৬ জন সাংসদের নেতা হয়ে এইচ ডি দেবেগৌড়া যখন ১৩ দলের ইউনাইটেড ফ্রন্টের মনোনীত প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন, গণতন্ত্রের পতাকা তখনই এ দেশে ভূলুণ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এই বিষয়টি লোকসভায় আমাদের দেশে সরকার কীভাবে গঠিত হয় সেই সংক্রান্ত এক বিতর্কে অংশ নিয়ে বলেছিলেন বিজেপির প্রয়াত সাংসদ সুবক্তা প্রমোদ মহাজন। এই সূত্রে একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে তাঁর চীন ভ্রমণের স্মৃতিস্মরণ করে তিনি বলেন যে, তাঁকে এক চৈনিক সাংসদ ভারতীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতি প্রকরণ সম্পর্কে জানতে চান। মহাজন তাঁকে জানান যে, তিনি একজন ভারতীয় লোকসভার নির্বাচিত সাংসদ। আর তাঁর রাজনৈতিক দলই তখন সংখ্যার বিচারে সর্বাধিক সাংসদের দল। কিন্তু তিনি শাসক দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তিনি বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসেবেই এসেছেন। একই সঙ্গে তিনি শ্রী পানিগ্রাহীকে দেখিয়ে বলেন, ইনিও একজন সাংসদ এবং দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সাংসদের দলের সদস্য হয়েও তিনি সরকারের অংশ নন, তবে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন দিচ্ছেন। এরপর এম.এ বেবি নামের এক সাংসদকে দেখিয়ে তিনি বলেন, ইনিও সংযুক্ত ফ্রন্টের সদস্য হলেও সরাসরি সরকারে নেই। এর পরই আসে চমকটি— মহাজন গোয়ার মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির (এমজিপি) সাংসদ রমাকান্ত মালাপকে দেখিয়ে বলেন, ইনি তাঁর দলের একমাত্র সাংসদ ও সরকারের অংশ।

মহাজনের এই ব্যাখ্যা তখনও ছিল জুতসই। কর্ণাটক নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যে নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে গেলেও ওই উদাহরণটিই হবে জুতসই। এর ওপর অবশ্য নিকট অতীতের গোয়া ও মণিপুরের প্রসঙ্গও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিতর্ক শুরু হয়েছে তথাকথিত বাজার চলতি দল বদল বোঝাতে Horse Trading নিয়েও। উঠছে মনপসন্দ রাজ্যগুলিতে দলত্যাগ, গরিষ্ঠতা প্রমাণের সময় অনুপস্থিতির প্রসঙ্গ। শেষমেষ তো Last Resort-এর খেলা শুরু হয়ে গেছে।

দেখে শুনে মনে হচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে গেড়ে বসা কিছু সংসদীয় কায়দা কানুনকে অনেকে দেখেও না দেখার ভান করছেন। এমন একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে যাতে মনে হয় যেন ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই এমন সব কাণ্ড শুরু হয়েছে। সেই অর্ধ শতাব্দী আগে হরিয়ানার গয়ালাল একদিনে তিন বার দল বদল করেছিলেন। তৎকালীন নামজাদা কংগ্রেস নেতা ওয়াই বি চ্যবন আখ্যা দিয়েছিলেন যা আজও চালু 'আয়া রাম গয়া রাম' রাজনৈতিক আপ্ত বাক্যটির। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের কংগ্রেস দল বদলের খেলায় এমন কুশলী খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল যে হরিয়ানায় ভজনলালকে তাঁর গোটা 'জনতা দল' নিয়ে কংগ্রেসে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। দলত্যাগ বিরোধী আইন লাগু হওয়ার পরও এই প্রক্রিয়ায় তেমন ছেদ পড়েনি। কেন্দ্রের প্রতিভূ হিসেবে রাজ্যপালদের সাধারণত একটু পাল্লা হয়তো টেনেই চলতে হয়। এই বিষয়টা আবার ছোটোখাটো অস্থির রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যপালদের আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে।

সমস্যাটা কিন্তু চালু ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে— কোনও দলের মধ্যে নয়। এটা স্বাভাবিক ধারায় যারাই ক্ষমতায় থাকবে তারাই পরিস্থিতিকে নিজ অনুকূলে আনার চেষ্টা করবে। উল্টো দিকে যারা ক্ষমতার বাইরে থাকবে তারা তো বিশেষ করে কর্ণাটকের মতো রাজ্য যদি বাগে পাওয়া যায় তাতে যে কোনও রকম কৌশল করতে কসুর করবে না। ২০১৯ সালে ভোটের আগে এমন একটি রাজ্যের নেতৃত্ব হাতে থাকলে বিরোধীদলের নেতা বলবার বা অন্তত দাবি করবার মতো জায়গা তো থাকবেই। তাহলে এর সমাধান কী?

আমাদের সাদা চোখে একটু দেখতে হবে যে আজকের তারিখে রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার পরিধি কিন্তু বিশাল, অনেক সময়ই তাদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার তৈরিতে ডাকার বাধ্যবাধকতা নাও থাকতে পারে। নির্বাচন পরবর্তী কোনও জোটকেও তাঁরা ডাকতে পারেন। কিন্তু কেবলমাত্র সংখ্যাতত্ত্ব মাথায় রেখে চললে গোয়া, মণিপুরে যেমন কিছুটা জনতার রায়কে আপাতভাবে হয়তো পুরো মান্যতা দেওয়া হয়নি (যদিও গোয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল খাতায় কলমে দাবিই জানায়নি), তেমনি কর্ণাটকের ক্ষেত্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে অগ্রাহ্য করলে জনতার রায়কেই অমান্য করা হবে।

নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাটিগণিতের হিসেব গুরুত্বপূর্ণ হলেও কর্ণাটকে জনতার রায় কখনই কংগ্রেস ও জনতা দল (এস)-এর পক্ষে ছিল না। তারা কোনও কোনও কেন্দ্রে একে অপরের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী জনতা দলের হাতেই

অতিথি কলম

বৈভব পুরন্দরে

হেরেছেন। এখন রাজ্যপালের ডাক পাওয়ার পর পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেছে। আপাতভাবে বিজেপির গরিষ্ঠতা নজরে পড়ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম বলবৎ করার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে।

যদি একেবারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম করে দেওয়া হয় যে, ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হলে এই এই ধাপে রাজ্যপাল কাজ করবেন যে নির্বাচন পূর্ব বা পরবর্তী জোটকে প্রথম ডাকবেন, তারপর আর এক দলকে সুযোগ দেবেন, তারপর পরের দল। এতে প্রক্রিয়াটি অনেক স্বচ্ছ হবে আশা যায়। এটি ত্রুটিমুক্ত হবে এমনটা বলা যায় না তবে অনেকটা ক্রিকেট আম্পায়ারের ধরনের হতে পারে। দলগুলির পারস্পরিক কাঁদা ছোঁড়া ছুঁড়ি যে কে কখন, কোথায় অসাধু উপায় অবলম্বন করেছিল তার কমে আসবে।

কর্ণাটকের চলতি পরিস্থিতিতে সুবিধে আদায় করতে কংগ্রেস দল তার ২০০৫ সালে বিহারের কালিমালিপ্ত অধ্যায় অজান্তে টেনে আনছে। সেই সময় আজকের রাজ্যপালকে কংগ্রেস যে কারণে গালি দিচ্ছে ঠিক সেই কারণে ২০০৫ সালে বিহারের রাজ্যপাল তথা কংগ্রেসের এককালীন মন্ত্রী বুটা সিংহের বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার একতরফা অনুমোদন দেওয়াকে সুপ্রিম কোর্ট বুটার বিরুদ্ধে Indictment প্রস্তাব নেওয়ার সুপরিশ করে এবং সেই সঙ্গে মনমোহন সরকারকেও তীব্র ভর্ৎসনা করেছিল। বলেছিল কেউ কোনও সুযোগ পাওয়ার আগেই কেন রাজ্যপাল বুটা সিংহ বিহার সরকার ভেঙে দিয়েছিলেন।

দল বদলের সমস্যাটি টিকে রয়েছে, তার কারণ আমরা ব্যক্তি বিশেষের দল ছেড়ে যাওয়াকে নিন্দামন্দ করলেও দল বেঁধে দলবদলিকে তেমন আমল দিই না। এই সূত্রে ২০০২ সালে বাজপেয়ী সরকার National Commission to review Constitution গঠন করলে তার রিপোর্টে দলবদল পুরোপুরি বন্ধ করার সুপারিশ করে এবং যে বা যারা দল বদলাবে তাকে বা তাদের পদত্যাগ করে পুনর্নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। এই সুপারিশ কিন্তু তলিয়ে যায়। কমিশন গঠনের পদ্ধতি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। এমন একটি শুভ প্রচেষ্টাকে দেশকে গৈরিকীকরণের অপচেষ্টা বলে আখ্যা দেওয়ার সঙ্গে এও বলা হয় যে সংবিধানগত ভাবে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে। এই ছাপ্পা মেরে দেওয়ার পর বাজপেয়ী সরকারের প্রয়োজনীয় সংস্কারমুখী কমিশনটির অন্যান্য সৎ সুপারিশকেও উপেক্ষা করা হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে অরুণাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের সরকার নিয়ে সমস্যার সময় সর্বোচ্চ আদালত রাজ্যপালদের কোনও রকম রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন থেকে সাবধান হতে বলেন ও ক্ষমতার অবাঞ্ছিত প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। কিন্তু কখন কাকে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিতে ডাকা হবে, কখনই বা বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা করতে হবে কিংবা কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত বা আইনানুগ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে নিশুতি রাতে ন্যায়াধীশের দরজায় কড়া নাড়াটা কি শোভনীয়?

তাই আদালতকক্ষের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার যে দিন ঘনিয়ে আসছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের উচিত ২০০২ সালের ন্যাশনাল কমিশনের সুপারিশ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিশনের রিপোর্ট, সারকারিয়া ও পুনচি কমিশনের রিপোর্ট (দু'জনেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে প্রথমে ডাকার কথা বলেছেন) যেখানে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে, সেগুলি একত্রে নিয়ে সংবিধান মোতাবেক গণতন্ত্র যাতে আরও সুচারু রূপে চালানো যায় ও দুর্নীতির সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। এমন সময়োপযোগী উদ্যোগ নেওয়া। ■

> এমন একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে যাতে মনে হয় যেন ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই এমন সব কাণ্ড শুরু হয়েছে। সেই অর্ধ শতাব্দী আগে হরিয়ানার গয়ালাল একদিনে তিন বার দল বদল করেছিলেন।... ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের কংগ্রেস দল বদলের খেলায় এমন কুশলী খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল যে হরিয়ানায় ভজনলালকে তাঁর গোটা 'জনতা দল' নিয়ে কংগ্রেসে ভিড়িয়ে দিয়েছিল।

রম্যরচনা

● ইয়েচুরি—মেহনতি মানুষের খাসির মাংস কেনার পয়সা কই? আমি তো আজ অবধি বাজার থেকে খাসির মাংস কিনে খাইনি। আরএসএস নিজের বিচারধারায় আমাদের প্রভাবিত করতে চাইছে।

● রেজ্জাক মোল্লা—চাষার ঘরের ব্যাটারা মাংস কিনে খায় না। গলায় ঝোলানো গামছাতে ভাগাড় থেকে মাংস নিয়ে আসে।

● পিসি—কে কী খাবে, কে কী পরবে... তা কি মোদী ঠিক করে দেবে! তোমরা পটোল খাচ্ছ, কুমড়ো কাটছ, পুঁটিমাছ খাচ্ছ... তাতে সমস্যা নেই, আর ভাগাড়ের মাংস খেলেই দোষ? 'মাংস সাথী' প্রকল্পে ভাগাড়ের মাংস প্যাকেটে করে বিক্রি হবে।

● রাহুল গান্ধী—গরিব বিরোধী সরকার। যার কাছে টাকা নেই সে কি মাংস খাবে না? সংসদ চলতে দেব না।

● লালু—মোদী জবরদস্তি করছে, আমাদের ইচ্ছা আমরা ছাগলের ঠ্যাং খাব না পচা ব্যাং খাব।

যত দিন থাকবে বিহারে লালু, তত দিন ভাগাড় থাকবে চালু।

● মায়াবতী—টাটকা মাংস ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতীক। ভাগাড়ের মাংসকে দলিত বলে অপমান করা হচ্ছে। রেস্তোরায় মাংসের মধ্যে ৪০ শতাংশ ভাগাড়ের মাংসের সংরক্ষণ চাই।

● যাদবপুরের বিপ্লবী ছাত্ররা—মাংস মানে মাংস। সে ভাগাড়ের হোক বা টাটকা। আমরা তো প্রতি শুক্কুর বার ভাগাড়ের মাংস দিয়ে পিকনিক করি। গোবলয়ের এই গেরুয়া সন্ত্রাসের প্রতিবাদে আমরা 'হোক ভাগাড়' আন্দোলন করব।

● মিডিয়া—টাটকা মাংস খাওয়া কি বাধ্যতামূলক! কোথায় দাঁড়াচ্ছে এই সমাজ! এই কি গণতন্ত্র?

উবাচ

"কর্ণাটকের কংগ্রেসি সাংসদ হরিপ্রসাদ যখন স্বয়ং বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার খারিজ করে দিয়েছেন, তখন কেন মিথ্যা অভিযোগের জন্য রাহুল গান্ধী ক্ষমা চাইবেন না?"

এস গুরুমূর্তি
প্রখ্যাত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

রাহুল গান্ধীর বিজেপির বিরুদ্ধে এম এল এ ভাঙানো প্রসঙ্গে টুইট বার্তায়

"তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া কি অন্যায়? একজন মহিলাকে জুতোর মালা পরিয়ে ঘুরিয়েছে তৃণমূলের গুণ্ডারা। তাঁর অপরাধ তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।"

কৈলাস বিজয়বর্গী
বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা

পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে

"কর্ণাটকে কংগ্রেস ও জেডিএস জোট অপবিত্র। কর্ণাটকবাসীর রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা সরকার গঠন করেছে।"

অমিত শাহ
বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি

কর্ণাটকে কং-জেডিএসের সরকার গড়া প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে

"প্রধানমন্ত্রী মোদী ও বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মজবুত হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি।"

নংথমবাম বীরেন সিংহ
মুখ্যমন্ত্রী, মণিপুর

নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের সম্মেলনে বক্তব্যে

"পুতিনের সঙ্গে আলোচনা দুই দেশের সম্পর্ককে দৃঢ় করবে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

সম্প্রতি রাশিয়া সফরে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বক্তব্যে

মুখোশসেরা মরে কিন্তু শেষ হয়ে যায় না

সন্দীপ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্র সিংহের পদবির যথার্থতা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি নাকি খাঁটি সিংহ নন। যদি হতেন তাহলে তিনিও প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডের মতো রুখে দাঁড়াতেন এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বৈরাচারী শাসককে মাথা নীচু করে প্রকৃত রাজধর্ম পালনে বাধ্য করতেন।

সমালোচকদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ অমরেন্দ্র সিংহের সাজানো চিত্রনাট্যে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর কেষ্ট-বিষ্টুদের কুশলী পারফরম্যান্সে বাংলায় এখন শ্মশানের স্তব্ধতা। গত চার দশকে পশ্চিমবঙ্গ যথার্থই ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছে। এই কালপর্বে এমন অনেক কিছু এ রাজ্যে ঘটেছে যা ভূভারতে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। সেই তালিকায় আর একটি বর্ণময় সংযোজন এবারের পঞ্চায়েত ভোট। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন মানেই ভোট-লুটেরাদের পোয়াবারো। অপরাধমনস্ক এক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অফুরান সাপ্লাইলাইন। বোমা পিস্তল ছুরি কাঁচি— যা হোক কিছু নিয়ে বিরোধীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। পশ্চিমবঙ্গে যদি ক্ষমতা ভোগ করতে চাও তাহলে বিরোধীদের বাঁচতে দিয়ো না। শাসকের এই মানসিকতায় বাঙালি অভ্যস্ত। কিন্তু ভোটলুটেরাদের বাধা দেওয়ায় প্রিসাইডিং অফিসারকে অপহরণ করে খুন করা হবে, এতটা বোধহয় বাঙালিও ভাবতে পারেনি।

সেই হতভাগ্য প্রিসাইডিং অফিসারের নাম রাজকুমার রায়। পেশায় শিক্ষক। ইটাহারের একটি বুথে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তৃণমূলের ছাপ্পাবাহিনীকে তিনি বাধা দিয়েছিলেন। এরকম একটি গর্হিত কাজের জন্য তৃণমূলের জহ্লাদেরা তাকে অপহরণ করে এবং খুন করে রেললাইনের ধারে ফেলে রেখে চলে যায়। না, এটা কোনও সাধারণ অপরাধীর কাজ নয়। রাজকুমারের খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ রেললাইনের ধারে ফেলে রাখার মধ্যেই স্পষ্ট, একটি নির্ভেজাল হত্যাকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পুলিশও এই পরিকল্পনার অঙ্গ। কারণ পুলিশও প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার তত্ত্বকেই সমর্থন করেছে। কোথা থেকে তারা এক রেলইঞ্জিন ড্রাইভারকেও ধরে এনেছে। তিনি নাকি স্বীকার করেছেন, কোনও এক ব্যক্তি তাঁর ইঞ্জিনের চাকার নীচে চলে এসেছিলেন।

শাসকের পিঠ বাঁচানো স্বীকারোক্তির জন্য তাঁর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কতটা স্ফীত হবে আমাদের জানা নেই। এটুকু জানা আছে ক্ষমতায় অন্ধ শাসক পোষা মিরজাফরদের বিনা পারিতোষিকে বিদায় করে না। কিন্তু শাসক যতই খুনকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করুক, একটা কথা ভুলে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী। যে নীতি এবং আদর্শের বিরোধিতা করে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সেই নীতি এবং আদর্শকেই আঁকড়ে ধরেছেন। ... ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তিনি যা করার করবেন। তাতে যদি দু'চারটে লাশ পড়ে তো পড়ুক, কিচ্ছু যায় আসে না।

গেলে চলবে না, ভোটের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই রাজকুমারকে টেলিফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। জানিয়েছেন রাজকুমারের স্ত্রী অর্পিতা। ধরে নেওয়া যেতেই পারে যারা হুমকি দিচ্ছিলেন, খুনও তারাই করেছেন। অথবা করিয়েছেন। আত্মহত্যা তিনি করেননি। ব্যক্তিগত জীবনে রাজকুমার ছিলেন সুখী। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে ছিল তার ভরাট সংসার। অনেকদিন ধরেই রাজকুমার অবসাদে ভুগছিলেন— পুলিশের এই তত্ত্ব এক কথায় বাতিল করে দিয়েছেন তাঁর পরিবার পরিজন।

আরও একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। বাঙালি সাধারণভাবে চায়ের কাপে তুফান তুলতে ভালোবাসে। বামপন্থায় পারদর্শী হবার পর থেকেই তার সমাজমনস্কতা লাটে উঠেছে। কিন্তু রাজকুমার রায়ের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্র বাঙালির অন্যরকম চেহারা দেখা গেল। গৃহকোণের নিভৃতি ছেড়ে বাঙালি বেরিয়ে এল রাস্তায়। উত্তাল হয়ে উঠল ইটাহার, রায়গঞ্জ। জনবিক্ষোভ উল্কার মতো ছড়িয়ে পড়ল ইসলামপুর, হরিরামপুর শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায়। রাজকুমার শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসি দেওয়ার কলাগাছির বাসিন্দা। কর্মসূত্রে থাকতেন রায়গঞ্জের সুদর্শনপুরে। শিক্ষকতা করতেন করণদিঘির দোমোহনির রহমতপুর হাই মাদ্রাসায়। তাই রাজকুমারের হত্যাকাণ্ডে প্রিয়জন হারানোর শোক অনুভব করেছেন স্থানীয় শিক্ষকেরা। বিক্ষোভে তারাই ছিলেন দলে ভারী। ছিলেন ভোটকর্মী এবং সাধারণ মানুষেরা। তাদের একটা ছেলে ছিল। ভাই ছিল। নির্মম শাসক তাঁকে নিকেশ করে দিয়েছে। রাজকুমারের রেখে যাওয়া শূন্যতায় এখন বাঙালি নিজেকে দেখছে। ভাবছে এরপর কে? পশ্চিমবঙ্গে শাসকের বিরোধী রাজনীতি করলে যে-কোনওদিন প্রাণ যেতে

পারে, এতদিন এটাই জানা ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ল্যাজে পা পড়লে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষকেও খুন করা হতে পারে। ভর্ৎসনা নয়, বদলি নয়, বরখাস্ত নয়— স্রেফ খুন করে খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ রেললাইনের ধারে ফেলা আসা হতে পারে। আতঙ্কই বাঙালিকে একজোট করেছে। প্রতিবাদের শক্তি জুগিয়েছে।

তবে এই প্রতিহিংসা-নির্ভর রাজনীতির স্রষ্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন। স্রষ্টার সম্মান বামপন্থী নেতাদেরই প্রাপ্য। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর বামপন্থী নেতারা এক দিক্‌বিজয়ী তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। এই তত্ত্বে বিরোধীদের কোনও স্থান নেই। যে কারণে এই রাজ্যে তখনকার প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের পার্টি অফিসগুলো কার্যত ক্লাবঘরে পরিণত হয়েছিল। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের যে ভূমিকা তার কিছুই কংগ্রেসের নেতারা পালন করতেন না। সে সময় যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলে থাকেন কংগ্রেস নেতাদের এই নিষ্ক্রিয়তার পিছনে ছিল টাকার খেলা। মমতা তখন কংগ্রেসে। তিনি আন্তরিক ভাবে চাইতেন কংগ্রেস বামফ্রন্টের কুশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলুক। কিন্তু কবি সমর সেনের ভাষায় পুরুষাঙ্গ বাঁধা দিয়ে বসে থাকা কংগ্রেসের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। মমতা প্রকাশ্যেই কংগ্রেস নেতাদের তরমুজ বলতেন। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতারা বাইরে সবুজ কিন্তু ভেতরে লাল। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসের উৎপত্তির কারণও ছিল মমতার তরমুজ না হতে চাওয়া মানসিকতা।

কিন্তু ক্ষমতায় এসে মমতা ছক বদলালেন। জ্যোতি বসু এবং প্রমোদ দাশগুপ্তদের মতো তিনিও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে বিরোধীশূন্য করার খেলায় মেতে উঠলেন। জ্যোতি বসুরা এই তত্ত্ব পেয়েছিলেন তাদের রাজনৈতিক জনক মাও-জে-দঙের কাছ থেকে। মাও বলেছিলেন, প্রতিবিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বাম আন্দোলন সফল হবে না। প্রতিবিপ্লবী কথাটির ব্যাপ্তি বিশাল। কিন্তু জ্যোতিবাবুরা তার সহজ বাংলা বের করে ফেললেন। তাঁদের কাছে কথাটির মানে পথের কাঁটা ক্ষমতার বাড়া ভাতে যারাই ছাই ফেলবে তারাই প্রতিবিপ্লবী।

মাও-এর তত্ত্বের আরেকটি দিকে রয়েছে ভয়। মানুষকে স্থায়ী একটা আতঙ্কের পরিবেশে রাখা। এই জন্যেই চীনকে তিয়েনইয়েন আম স্কোয়ারে ধ্বংসলীলা চালাতে হয়। উদ্দেশ্য খুবই সহজ। একসঙ্গে অতগুলো তাজা জোয়ান ছেলে মারা গেলে সর্বত্র বার্তা দেওয়া যাবে, শাসকের বিরোধিতা করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালি জ্যোতি বসু এবং প্রমোদ দাশগুপ্তরাও ছিলেন মাও-তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাই পশ্চিমবঙ্গে মরিচঝাঁপির সংগঠিত হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, জ্যান্ত মানুষগুলোকে হিংস্র পশুদের মুখে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। পুলিশ সাংবাদিকদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল ইতিহাসের অন্যতম নারকীয় হত্যালীলা। এখানেই শেষ নয়। এরপর রয়েছে বিজন সেতুতে আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের পুড়িয়ে মারার ঘটনা। সাম্প্রতিক অতীতের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে পাওয়া যাবে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম- গড়বেতা-কেশপুরের দৃষ্টান্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দাও। যাতে কেউ মাথা তুলতে না পারে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে শুরুতেই দমন করো। আমার হাতে অর্থ আছে, ক্ষমতা আছে— সুতরাং আমি যা বলব সেটাই আইন। বামপন্থীদের এই মানসিকতা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সারা বিশ্বে। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। দিনের পর দিন 'মানছি না মানব না' রাজনীতির জেরে জনগণের একটা বিশাল অংশ ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোজীতে পরিণত হয়েছে। লোভে আর ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী। যে নীতি এবং আদর্শের বিরোধিতা করে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন, ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সেই নীতি এবং আদর্শকেই আঁকড়ে ধরেছেন। রাক্ষসীলীলায় মমতা হাত পাকিয়েছেন কিষেণজীকে হত্যা করিয়ে। না, কিষেনজী কোনও মহানায়ক নন। কিন্তু তিনি খলনায়ক বলেই তাকে হত্যা করা যায় না। মমতার করা উচিত নয়, কারণ কিষেনজীকে ধরেই তিনি জঙ্গলমহলে পা রেখেছিলেন। মানুষের কৃতজ্ঞতা না থাক চক্ষুলজ্জা থাকা উচিত। মমতার তাও নেই। তিনি জানতেন ব্যবহার করার পরেও কিষেনজীকে বাঁচিয়ে রাখলে তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠতে পারে। তাই সুচিত্রা মহাতোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে কিষেনজীকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিয়েছেন। এরপরও অজস্র ঘটনায় আমরা মমতার অমানবিক আচরণ লক্ষ্য করেছি। যেটা কখনও পার্কস্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ড, কখনও অম্বিকেশ মহাপাত্র কাণ্ড। রামনবমীর দিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর মিথ্যে অভিযোগে বাইশজন হিন্দুত্ববাদী যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল মমতার পুলিশ। তারা এখনও মুক্তি পায়নি। পুলিশ এমনসব কেস দিয়েছে তাদের নামে, কবে মুক্তি পাবে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। মমতার অমানবিক আচরণের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন রাজকুমার রায়। রাজকুমারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে মমতা এখনও পর্যন্ত একটি শব্দও খরচ করেননি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের উন্মত্ত আচরণের নিন্দা করেছেন। মমতা তাঁর প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ছোটখাটো বিষয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি ভদ্রতা সৌজন্য ইত্যাদির ধার ধারেন না। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তিনি যা করার করবেন। তাতে যদি দু'চারটে লাশ পড়ে তো পড়ুক, কিচ্ছু যায় আসে না।

দুঃখ হয় রাজকুমার রায়ের কথা ভেবে। তিনি প্রতিবিপ্লবী নন, ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগীও নন--- তবুও তিনি মাও-দর্শনের চোরাবালিতে তলিয়ে গেলেন। তবে আশা করব, রাজকুমারের মৃত্যু অনেক রাজকুমারের জন্ম দেবে। কারণ মুথোঘাসকে মেরে শেষ করা যায় না। সে জন্মায়, মরে, আবার জন্মায়। বড়ো হয় এবং একদিন শাসকের আত্মম্ভরিতার গজদন্তমিনারকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। ■

গুজরাট দাঙ্গার খবরের বেশিরভাগ ফেক-নিউজ

নীতীন রায়

সারা পৃথিবী আলোড়িত হয়েছে একটি শব্দে—ফেক নিউজ, তাও আবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখ থেকে শুনে। ট্রাম্প 'আন প্রেডিক্ট্যাবল'। কোন দিক দিয়ে শুরু করে সবাইকে দুমড়ে মুচড়ে দেবেন তা বলা কঠিন। খুবই অল্প সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজ প্রভাব বাড়িয়ে চলেছেন। ফেক নিউজ শব্দটি কদিন আগে অলিতে গলিতে ঘুরছিল। ট্রাম্পর বয়ানে চলে এলো রাজপথে। শব্দটি Collins Dictionary-তে শব্দ হিসেবে স্থান পেয়েছে।

পেড নিউজের থেকে ফেক নিউজে সাংবাদিকতা গিয়ে ঠেকেছে। মূল্যবোধহীন সাংবাদিকতাই এর জন্য দায়ী। পশ্চিমের এক সাংবাদিক বলেছেন, 'খবর যখন জুতো পরতে শুরু করে, Fake News তখন সারা পৃথিবী ঘুরে ফেলে।' পরিবেশনার কায়দায় ফেক নিউজ দ্রুত জনসমাজে ছড়িয়ে পরে। এ-প্রকার সংবাদ গোয়েবলসিয় তত্ত্বেরই বিস্তারিত রূপ। ফেক নিউজ বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি জিনিস চোখে পড়ে। এর একটি (১) targeted শ্রোতা বা দর্শকমণ্ডলী রয়েছে। (২) কনটেন্ট সার্পোটেড বাই ফলস এভিডেন্স, (৩) চটকদার শব্দ ও (৪) এই সঙ্গে অন্যান্য প্রচার শৈলীকে কাজে লাগানো, যথা—মিছিল, মিটিং, সভা প্রভৃতি।

আজকের পৃথিবীতে অনেকেই ফেক নিউজের শিকার হয়েছেন। তার মধ্যে ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদী প্রধান শিকার। ফেক নিউজের মাধ্যমে মোদীকে মুসলমান বিরোধী ও দাঙ্গাকারী প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে। আর ট্রাম্পকে এক ভারসাম্যহীন রাজনীতিবিদ এবং মুসলিম বিরোধী হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ট্রাম্প উত্তর কোরিয়া ও সিরিয়া নিয়ে রাশিয়া ও চীনকে যেভাবে কোণঠাসা করেছেন তাতে তাঁর সুচিন্তিত সামরিক জ্ঞানের প্রকাশ অস্বীকার করার উপায় নেই।

এবার ফেক নিউজের স্বরূপ কেমন দেখা যাক। কোনও ঘটনার অর্ধসত্য রূপ দিয়ে, জনমনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা কিংবা সম্পূর্ণ মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো। ফেক নিউজের ওপর যখন রাজনৈতিক দল নির্ভর করে ও অপরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে তখন তার উল্টোপথে জনগণের ক্ষতি করে। খবরকে twist করাও কারও পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে যখন জেহাদি আক্রমণ হয় তখন আমেরিকার পত্রপত্রিকার নিজস্ব সেন্সর সিস্টেম অ্যাকটিভ বা সক্রিয় হয়ে ওঠে। জর্জ বুশ বলেছিলেন এমন অনেক ঘটনা ঘটবে যা পর্দার আড়ালে থাকবে। তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি সেখানকার মিডিয়া। গণতান্ত্রিক

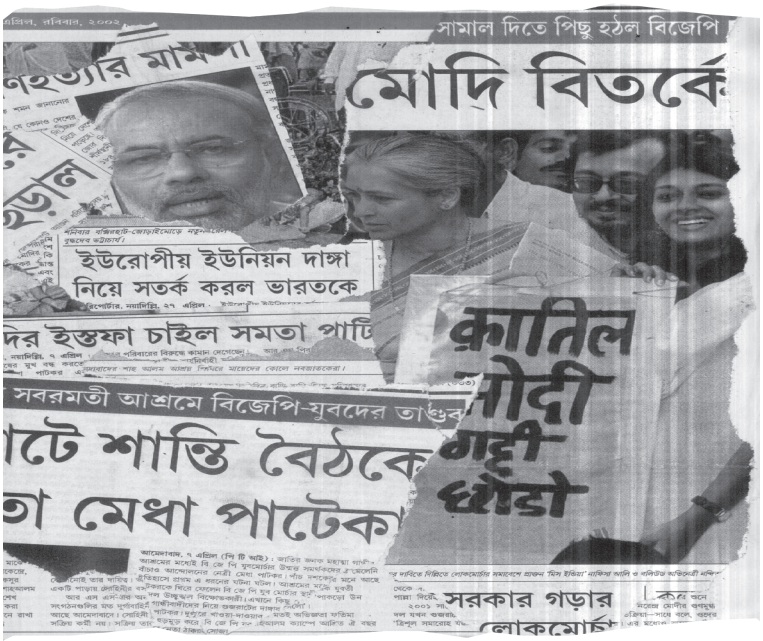

'ফেক নিউজ' শব্দটি জনতার দরবারে এসেছে। জনতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে। সংবাদ সংস্থার খবর নিয়ে বিচার বিবেচনা শুরু হয়েছে। ফেক নিউজ থেকে দীর্ঘস্থায়ী লাভ হবার সম্ভাবনা কম। ঝড় তোলা তার চরিত্রে রয়েছে। ভারতবর্ষ সত্যের সাধনায় ডুবে আছে। এখানে মিথ্যা ভেসে যাবে। ভেসে উঠবে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

অধিকারের নাম করে জর্জ বুশকে কেউ বিরক্ত করেনি। কিন্তু আমাদের দেশে সেনার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে অনভিপ্রেত প্রশ্ন তোলা হয়।

অতি সম্প্রতি বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুজনিত ঘটনা ফেক নিউজের আওতায় এসেছে। গুজরাটের দুই মাফিয়ার বিরুদ্ধে এনকাউন্টার হয়। মারা যান গ্যাং স্টার সোহারবুদ্দিন ও প্রজাপতি। কংগ্রেস হইচই শুরু করে, বলে---অমিত শাহ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত। ইউপিএ সরকার সিবিআই তদন্তের আদেশ দেয় এবং সিবিআই আদালতে চার্জশিট পেশ করে। বিচারপতি লোয়া অমিত শাহকে দায়মুক্ত করেন। এটা হলো প্রথম পর্বের ঘটনা।

দ্বিতীয় পর্বে, একটি বিয়ে বাড়িতে হার্ট অ্যাটাকে লোয়া মারা যান। সেখানে চারজন বিচারপতি উপস্থিত ছিলেন। এটা ২০১৪ সালের ঘটনা। হঠাৎ ২০১৭ সালে 'দি ক্যারাভান' পত্রিকায় তা নিয়ে লেখা শুরু হয়। মামলা সুপ্রিম কোর্টে গড়াল। সেখানে মামলা খারিজ হয়ে যায়। তিন বছর পর বিচারপতি লোয়ার মৃত্যুকে অস্বাভাবিক আখ্যা দিয়ে প্রচার শুরু হয়। এটা ছিল ফেক নিউজ।

গুজরাট দাঙ্গার যে সমস্ত ছবি খবরের সঙ্গে প্রদর্শিত হয় তার অধিকাংশই ছিল ফেক (নকল) ছবি। আদালতে সেইসব ছবি মান্যতা পায়নি শুধু নয়, তিস্তা শীতলাবাদকে আদালত কড়া বার্তা দেয়। ভুল ও মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য শীতলাবাদের ৩ বছরের সাজা ঘোষণা হয়। এই সঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন এই কাণ্ডকারখানা যারা ঘটান তারা খুব শক্তিশালী। কারণ তিস্তা শীতলাবাদের এনজিও সুদূর আমেরিকায় অর্থসংগ্রহ করে স্টুডিওতে ছবি তোলায় এবং নানা সভা সমিতি করে ফেক নিউজকে সত্য বলে চালাতে শুরু করে। পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জিকে গুজরাট দাঙ্গার ছবি নিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বলেন, ফটোগ্রাফার কি দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছিল? এগুলো হয়তো স্টুডিওতে তোলা ছবি।

'হিন্দু টেরর' কথাটিও ফেক নিউজের আওতায় আসে। সমঝোতা এক্সপ্রেস ও মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে যে অপপ্রচার ও কিছু লোককে নির্যাতন তা ছিল ষড়যন্ত্রমূলক এবং ফেক নিউজের উপাদান দ্বারা গঠিত। এফবিআই বহুপূর্বেই জানিয়েছে দুটো বিস্ফোরণই এলইটি বা লস্কর ই তইবার। হিন্দু টেরর শব্দটির অপপ্রয়োগ করে এবং নানা তথ্য দিয়ে দি ক্যারাভান (The Caravan) পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হয়। আরএসএসের কার্যকর্তাদের নাম জড়িয়ে হিন্দু টেরর শব্দের সপক্ষে মিথ্যা অপপ্রচার চালায় জাতীয় কিছু সংবাদপত্র।

ফেক নিউজ এবং হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বড়সড় প্রচার চালনায় তিনটি কাগজ কাজ করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। একটি The Cobra Post, The Tahelka এবং The Caravan। কিছুদিন আগে একটি টিভি চ্যানেলের স্টিং অপারেশনে আরও অনেক কিছু সামনে আসে। The Cobra Post ২০১৯-এ ফেক নিউজ করবার জন্য একজনকে নিয়োগ করেছে। হিন্দু সন্ন্যাসীর পোশাকে সজ্জিত আচার্য অটল। হিন্দু সন্ন্যাসীর পোশাক কেন? বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের ভরসায় নিজেকে রাখার ও তাদের নিকট তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য। আদতে তিনি Blackmil করার জন্য কুখ্যাত। আচার্য অটলের ব্যবহারিক জীবনের চেহারা ও আচার্যের ছদ্মবেশী চেহারার আকাশ পাতাল পার্থক্য। জাতীয় চ্যানেলটি তার উপরও আলোকপাত করেছে। দি তহলকা (Tahelka) কারগিল যুদ্ধের সময় বাজপেয়ী সরকারকে মিথ্যে জালে ফাঁসিয়ে দেয়। জনগণের উপর তার বিরাট প্রভাব পড়েছিল। পরবর্তীতে বিজেপি বিরোধিতা নিরন্তর করে গেছে এবং এই পত্রিকার সম্পাদক নারী নির্যাতনে অভিযুক্ত হয়ে সম্প্রতি কারাবাস করছে।

The Caravan পত্রিকায় ইচ্ছেকৃত লিক করিয়ে দেওয়া খবর প্রকাশিত হয়। হিন্দু টেরর নিয়ে নানা প্রবন্ধ নানাভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা ইন্দ্রেশজীকে নিয়েও নানা গালগল্প ফাঁদে। স্বামী অসীমানন্দের নামে স্বীকৃতিপত্রও ছাপায়।

এই মুহূর্তে ফেক নিউজ হচ্ছে—বিজেপি সরকার বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করছেন। এর কোনও প্রমাণ নেই। প্রধান বিচারপতির ইচ্ছে অনুসারে বিভিন্ন মামলা বিভিন্ন বিচারপতির এজলাসে বণ্টিত হয়ে থাকে। ৭০ বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলছে। কিন্তু বিরোধীদের হঠাৎ মনে হলো এটা মোদীর জন্যই হচ্ছে। প্রমাণ নেই, কিন্তু ইমপিচমেন্ট আনতে হবে। রাজনৈতিক পরাজয়কে নিয়ে যাওয়া হলো দেশের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত। গণতন্ত্রের সীমানা হারিয়ে গেলো লোভ আর কদর্য বিচারে।

নোটবন্দির সময় নানা খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল যার মধ্যে একটি খবর ছিল ২০০০ টাকার নোটে চিপস্ রয়েছে। কিন্তু আদতে তা নয়। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে রেলে সিট নিয়ে গোলমাল হয়। তাতে একজনের মৃত্যু হয়। সেটাকে হিন্দু মুসলমান রং দিয়ে নানা কায়দায় কয়েকটি টি ভি চ্যানেল খবর পরিবেশন করে। আদালতে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। 'অ্যাওর্য়াড বাপসি' বলে যে বিজেপি বিরোধী হাওয়া তোলা হয়েছিল তাও ফেক নিউজের উপর নির্ভর করে।

তবে এটা ভালো যে, 'ফেক নিউজ' শব্দটি জনতার দরবারে এসেছে। জনতা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে। সংবাদ সংস্থার খবর নিয়ে বিচার বিবেচনা শুরু হয়েছে। ফেক নিউজ থেকে দীর্ঘস্থায়ী লাভ হবার সম্ভাবনা কম। ঝড় তোলা তার চরিত্রে রয়েছে। ভারতবর্ষ সত্যের সাধনায় ডুবে আছে। এখানে মিথ্যা ভেসে যাবে। ভেসে উঠবে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। ■

সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে নিয়ে অনুষ্ঠান হচ্ছে তাঁর অবদান নিয়ে দেশবাসীর ভাবনা কতটুকু?

দেবীপ্রসাদ রায়

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষ পালনে সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানে দেশবাসী অংশগ্রহণ করছে। যতটা ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত ছিল ততটা না হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার প্রসঙ্গে তাঁর নাম বারবার উঠে আসায় সাধারণ দেশবাসী উচ্ছ্বসিত হয়েছে, গৌরববোধ করেছে, যতটুকু তারা জানতে পেরেছে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান নিয়ে বা যতটুকু তাদের জানানো হয়েছে ততটুকু নিয়েই। তারা জেনেছে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর নামে পদার্থবিদ্যার একটি বৈপ্লবিক সূত্র আছে—'বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফরমুলা' (সংখ্যায়নিক সূত্র)। এই শতকের প্রথমেই একটি নোবেল পুরস্কার এসেছিল 'বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট' আখ্যায়িত পদার্থের একটি ঘনিত অবস্থা আবিষ্কারের জন্য—প্রাপক ছিলেন উলফগ্যাং কেটারলি-সহ আরও দুজন পাশ্চাত্য পদার্থবিদ। এই আবিষ্কারের সূত্র ছিল 'বোস- আইনস্টাইন ফরমুলা'। তাই সত্যেন বসু নোবেল পুরস্কার না পেলেও তাঁর ভূমিকার জন্য উদ্বেল হয়েছে দেশবাসী। একই ঘটনা কিছুকাল পরে আবার ঘটেছে 'হিগসবোসন' বা তথাকথিত 'ঈশ্বরকণা' আবিষ্কারের সময়। আবার পত্র-পত্রিকায় সত্যেন বসুকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে, উচ্ছ্বাসের বন্যা বয়ে গেছে। এর আগেও ওই সূত্রকে অবলম্বন করে গবেষণায় নোবেল পুরস্কার এসেছে। কিন্তু যদি একটি সমীক্ষা চালানো হয় তা হলে দেখা যাবে বসুর কী কী অবদান আছে বিজ্ঞানে, তার ভাসা ভাসা উত্তর দিলেও অনেকেই---ছাত্র শিক্ষক এমনকী বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষ নির্দিষ্টভাবে তেমন কিছু বলতে পারবেন না, পারছেন না। কারণ বসুর প্রকৃত অবদান

ঠিকমতো বিজ্ঞাপিত হয়নি সাধারণের কাছে। তাই তেমন কোনও কৌতূহলও সৃষ্টি হয়নি। ঠিক সে জন্যই যেরকম ব্যাপকভাবে স্কুল কলেজে সত্যেন বসুর অবদান নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। বর্তমান নিবন্ধটি সেদিকটি নিয়েই।

সত্যেন বসুর অবদানগুলি কী?

(১) সনাতন বা নিউটনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি হঠাৎই কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণে কীভাবে শক্তি বণ্টিত আছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গ-কম্পাংক অনুযায়ী, তার জন্য পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্ল্যাংকের সূত্রটি উদ্‌বর্তনে সংকট তৈরি হয়েছিল ভীষণভাবে। যার নাম 'অতিবেগুনী বিপর্যয়' বা Ultraviolet Catastropha। বসু তাঁর উদ্ভাবিত গণনা পদ্ধতিতে সে সংকট কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত গণনা পদ্ধতিটি একান্তভাবে তাঁরই ছিল—আইনস্টাইনের কোনও ভূমিকাই ছিল না—আইনস্টাইন সেটি পেয়ে তার প্রয়োগ করেছিলেন একাবু গ্যাসের ক্ষেত্রে। বসুর প্রেরিত সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি জার্মান জার্নাল Zeils für Physik প্রকাশনার ব্যবস্থা করার সুবাদে পাশ্চাত্যে বসুর গণনাকেই 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন সূত্র' বলা হতে থাকে। এই সূত্র প্রয়োগেই প্ল্যাংকের বণ্টন সূত্রটির উদ্‌বর্তন সম্ভব হল সনাতন তত্ত্ব-নিরপেক্ষভাবে।

(২) কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণে শক্তির বণ্টন সূত্রে এই গণনার প্রভাবকে সার্থকতার দিকে নিয়ে গেছে মৌলকণার জন্য (এখানে ফোটন) বসু প্রবিষ্ট 'স্পিন' ধারণা—যা আইনস্টাইনের ধারণার বাইরে ছিল এবং যা আইনস্টাইন জানতে পারেননি। এর কারণ সম্ভবত ততদিনে আইনস্টাইন নিজেই তাঁর প্রস্তাবিত কোয়ান্টাম ধারণা থেকে সরে যাচ্ছিলেন—অনেক সমকালীন বিজ্ঞানীকেই তিনি স্পষ্টভাবে তা জানিয়েছিলেন। তার অনেক প্রমাণ আছে। বসুর 'স্পিন' ধারণা গ্রহণ করতে তিনি অসমর্থ ছিলেন। আধুনিক কণাপদার্থবিদ্যার অগ্রগতির প্রাণকেন্দ্রে আছে 'স্পিন' ধারণা। আদর্শমানক বা [Standered Model] সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পিটার হিগস্ যে কণার কল্পনা করেছিলেন সার্ন (CERN)-এর এল.এইচ.সি (LHC---লার্জ হেড্রন কলাইডার)-এ, সেই কণাই বসুর ধারণা সম্ভূত বোসন কণা বা 'হিগস বোসন'-এ ধরা পড়েছিল। আমাদের সৌভাগ্য প্রকৃত বিজ্ঞান সংস্কৃতি এই নামকরণে রক্ষা পেয়েছে।

(৩) ইলেকট্রনের, কণা এবং তরঙ্গ—এই দ্বৈত সত্তার প্রস্তাব রেখেছিলেন লুইস-ডি-ব্রগলি তাঁর ডক্টরেট থিসিসে। এটি পেয়ে ল্যাগভাঁও (Langevein) এর একটি কপি আইনস্টাইনকে পাঠাতে বলেছিলেন ডি-ব্রগলিকে। যে ভাবে $E=mc^2$ সমীকরণের সদৃশতা (analogs) দেখিয়ে

ছিল এই প্রস্তাব তা আইনস্টাইন গ্রহণ করেননি —প্রস্তাবটি পড়েই ছিল। বিকিরণে গড় শক্তি - ঘনত্বের দুল্যমানতা (Fluctuation) নিয়ে বসু তাঁর নিজস্ব গণনা ভিত্তিক যে ব্যাখ্যা পাঠিয়েছিলেন আইনস্টাইনকে, তার আলোকে আইনস্টাইন নিজের গণনার (১৯০৯) পুনর্মূল্যায়ন করেন এবং তাঁর সংশোধিত গণনায় ডি-ব্রগলি প্রস্তাবটি আনুকূল্য পায়—কণা-তরঙ্গ দ্বৈত তত্ত্ব স্বীকৃতি পায়। ডি-ব্রগলি নোবেল পুরস্কার পান।

(৪) বসু প্রস্তাবিত 'স্পিন' ধারণার সাহায্যে মৌল কণার নতুন পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণ বা অখণ্ড 'স্পিন' মানযুক্ত কণারা হয় 'বোসন' এবং খণ্ড মানযুক্ত কণারা হয় ফার্মায়ন। প্রথম কণারা বসু সংখ্যায়ন অনুসরণ করে, যেমন—ফোটন, α-কণা, হিলিয়াম...এই কণাদের তরঙ্গ ফলন (Ψ) প্রতিসম (Symmetric)। যেমন, ফোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন —এই কণাদের তরঙ্গ ফলন (Ψ)—অপ্রতিসম (Antisymmtric) আধুনিক কণা পদার্থবিদ্যা যা বসুর 'স্পিন' ধারণা নিয়েই শাসিত হয়। বসুর ধারণার সফল রূপায়ণ হলো ৮৮ বছর পরে 'হিগস বোসন' কণার চিহ্নিতকরণে সি.ভি.রমন এবং ভগাবন্ডস 'স্পিন' নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং ইতিবাচক ফল 'Nature'-এ বিজ্ঞাপিত করেন (৩রা অক্টোবর, ১৯৩১)। ফলাফল নিয়ে নিলস্‌বোর- এর সঙ্গে রমণের মত বিনিময় হয়।

ব্রহ্মাণ্ড রহস্য উন্মোচনের জন্য যে মানকে আদর্শ (Standared model) হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল বোসন কণা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে। শুধু তাই নয়, যে মহাকর্ষশক্তি ক্ষেত্র এই মডেল-এর বাইরে ছিল সেই ক্ষেত্রের কল্পিত বাহক কণা গ্রাভিটোন (graviton), সাধারণ মৌল কণার ভরপ্রদানকারী হিগস বোসন-এর ভূমিকাকে দূরে রাখতে পারছে না—অদূর ভবিষ্যৎ এই ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করতে পারে। একটি অসাধারণ প্রাপ্তি হলো সব ক্ষেত্রকণারাই (field particles) বোসন।

তড়িৎ চুম্বকীয় বলক্ষেত্রের বাহক কণা ফোটন, নিউক্লীয় তীব্র কণা W±, Zo বোসন এবং সর্বশেষ আবিষ্কৃত স্বতঃস্ফূর্ত সমতা ভঙ্গকারী (Sponteneous Symrnetry breaking) হিগস বোসন।

এ ছাড়াও বসুর যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলি সাধারণভাবে চোখের আড়ালে থেকে গেছে সেগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সময় নিশ্চিতভাবে উপস্থিত হয়েছে।

আইনস্টাইনকে পাঠানো বসুর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি ছিল তাঁর মতে, প্রথম পত্রের তুলনায় আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক। আইনস্টাইন আলোর নিঃসরণ, শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ে নিজস্ব তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন (A, B, স্থানাংক)। সেই তত্ত্ব মোতাবেক কিছু অন্যথা বসুর পত্রে পেয়েছিলেন এবং তাঁর আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন বসুকে। এও বলেছিলেন যে বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় এ নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। কিন্তু তাঁর মৌলিক গণনা পদ্ধতি নিয়ে গভীরভাবে প্রত্যয়ী ছিলেন। সেই এক প্রত্যয় নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় পত্র 'Thermal Equilibrium of radiation Field in Presence of matter' নিয়ে আইনস্টাইনকে জানিয়ে ছিলেন 'The problem of thermodynamic equilibrium of radiation in the presence of material particles can however be studied using the methods of statistical mechanics independently of any special assumption about the mechanism of the elementary processes on which the energy exchange depends.' আইনস্টাইন তাঁর A, B. Cafficieath ব্যবস্থা করে নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সনাতন-তত্ত্ব নিরপেক্ষ হচ্ছে না, তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছিলেন অথচ বসুর গণনা নির্ভর উপস্থাপনকে মানতে পারছিলেন না। বসু আর একটি পত্রে (তৃতীয় পত্র) তাঁর যুক্তিগুলি সাজিয়ে দিয়েছিলেন সাক্ষাৎকারের সময় আলোচনার সুবিধে হবে বলে। বসুর যুক্তিগুলিকে দ্বিধাহীন সমর্থন জানিয়ে ল্যাগভাঁও তা প্রকাশ করার অনুকূলে ছিলেন কিন্তু আইনস্টাইনের আপত্তিতে তা কোনও জার্নালে প্রকাশ পেল না। দীর্ঘদিন ধরে কোয়ান্টাম ধারণা নিয়ে স্ববিরোধিতায় ভোগা আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম ধারণার মধ্যে আইনস্টাইনের কাঙ্ক্ষিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই রাখা বসুর শূনগর্ভ তরঙ্গ (empty Waves) প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দিতে চাইলেন না। যদিও পরবর্তীকালে 'Cavily Quantum Electrodynamics'র উদ্ভবে তাকে স্বীকৃতি দেন। বসুর প্রস্তাব ধরেই এই 'Cavily Quantum Electro Dynamics'-এর উদ্ভব। বসুর সঙ্গে আইনস্টাইনের একবারই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল বার্লিনে কিন্তু তখন আইনস্টাইন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় পত্র নিয়ে বসুর সঙ্গে কোনও আলোচনার সুযোগ দেননি। তাঁর একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব (Unified field)-র দিকেই আলোচনাকে চালিত করেছিলেন। হতাশা নিয়েই ফিরেছিলেন সত্যেন বসু। জনান্তিকে বলেছিলেন বলে জানা যায় 'The old man built me in the first paper and killed me in the Second.'

একীকৃত [মৌল বলক্ষেত্রগুলির অভিজ্ঞতা ভিত্তিক] তত্ত্ব বিকাশের একটি পর্যায়ে গুরুতর সমস্যায় পড়েছিলেন আইনস্টাইন। উদ্ভূত ৬৪টি সমীকরণের সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এমনকী বিখ্যাত পদার্থবিদ গণিতজ্ঞ নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিংগার এগুলির সমাধান প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন '...it is next to impossible.'

সত্যেন বসু ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে সমস্যাটিকে গ্রহণ করলেন। এক বিশেষ ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাধান করে তা আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিলেন। আইনস্টাইন প্রাপ্তিসবাদ-সহ চিঠি দিলেন বসুকে (৪।১০।১৯৫২)। তাতে জানালেন সমাধানটি গাণিতিক সুষমামণ্ডিত কিন্তু পদার্থবিদ্যায় প্রয়োগে তাৎপর্যহীন। '...Do the singularity free solutions of the equation system have phsical meaning? Are there at all singularity

free solutions which correspond to the atomic character of matter and radiation?' সম্ভবত বসু তা মনে করেননি। তাই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার জন্যই বসুর যাওয়ার কথা ছিল আমেরিকায় আইনস্টাইনের কাছে। কিন্তু ১৯৫৫ সালে আইনস্টাইনের মৃত্যুতে তা হল না। আন্তর্জাতিক কূটনীতির জন্য বসুর পাসপোর্ট পেতে দেরি হচ্ছিল। ফলে 'অজানাখনির নূতন মণির হার' যা দিতে পারতেন সত্যেন বসু, তা থেকে হয়তো বঞ্চিত থেকে গেল বিজ্ঞান জগৎ।

Wave mechanics-এ তরঙ্গ সমীকরণের জন্য বিখ্যাত শ্রোয়েডিংগার। সেই শ্রোয়েডিংগার তাঁর সমীকরণের জন্য লুইস-ডি-ব্রগলি এবং আইনস্টাইনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ২০ এপ্রিল ১৯২৬-এ তিনি লিখেছেন, 'By the way the whole thing could not have been started at present or any time (I mean as far as I am concerned) had not your second paper (Einstein) on the degenerate gas directed my attention to the importance of de Broglie's ideas [Letter of Wave mechanics edited by K. Perzibran and translated and introduced by M.J. Klein. Phil, Lib. New York, p.23]'

কিন্তু যারা ওয়াকিবহাল প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে তাদের একজন নোবেলবিজয়ী পদার্থবিদ ম্যাক্সবর্ন লিখেছেন, 'The last of Einstein's investigations which I wished to discuss in this report is his work on Quantum theory of monatronic edeal gases. In this case the original idea was not his but came from an Indian Physicist S.N.Bose [Einstein : Philosophex Scientist by Pul Arthor Schialbp—Tudor Publishing Co. New York 1951]'

তা হলে কণা-তরঙ্গ দ্বৈতবাদ, তরঙ্গ সমীকরণ—এ সবের জন্য কার কাছে ঋণ স্বীকার করার কথা? S.N.Bose নয় কি? কিন্তু এসব তথ্যগুলি তো আড়ালেই থেকে গেছে। সত্যেন বসুর অবদানকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা দরকার ছিল কিন্তু সে কাজ হয়নি।

১৯৪৯ সালে আইনস্টাইন লিখেছিলেন, 'I am convienced that the statistical quantum theory...is superficial and that one must be backed by the principle of general relativity.'

সত্যেন বসু তো এই কাজটাই করতে যাচ্ছিলেন---বোঝাতে চাইছিলেন আইনস্টাইনকে—'I have tried to look at the radiation field from a new stand point and have sought to separats the propagation of quantum of energy from the propagation of electromagnetic influence. I seem to feel vagualy that some such seperation is necessary if quantum theory is to be brought in line with General Relativity Theory.' (২৭।২।১৯২৫) সত্যেন বসুর প্রস্তাবেই অস্থিরচিত্ত আইনস্টাইন ১৯৫৪ সালে এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, [Subtle is the Lord, Abraham Pais]. 'I must seem like an ostrich who forever burries its head in the relativigtic sand in order not to face the evil quantum.'

এইসব কিছু তথ্যের আলোয় পদার্থবিদ্যায় বসুর অবদান আরও কিছুটা স্পষ্ট হ'তে পারত। দেশবাসীর কাছে কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে দৃশ্যমান হতে পারত, কিন্তু দেশবাসীকে সে সৌভাগ্য থেকে দূরে রাখা হয়েছে; তাদের গ্রহণ ক্ষমতা দুর্বল—এই ধারণায় কি?

এই লেখা পরিপূর্ণভাবে সাধারণের বোধগম্যমূলক হয়তো নয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে সৃষ্ট কৌতূহল যা এতদিন উপেক্ষিত ছিল তা সামনে এলে সৃজনশীল ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক হতে পারে। দেশ এই সৃজনশীল ভবিষ্যৎই কামনা করে।

(লেখক প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, বাঁকুড়া)

বাংলাদেশের ইসলামিকরণে মডেল মসজিদ প্রকল্প

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে ইসলামি ধারাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ বছরই মডেল মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে। এজন্য এ মাসেই টেন্ডার আহ্বান করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জানা গেছে, প্রথম দফায় ঢাকা-সহ বিভাগীয় শহরগুলোতে ১০টি মসজিদ নির্মাণ করা হবে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে সর্বমোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। প্রকল্পটি সৌদি অর্থায়নে হওয়ার কথা ছিল। তবে পরবর্তীতে সৌদি আরবে নতুন শাসন চালু হওয়ার পর এ বিষয়ে নীরব থাকায় ধর্ম মন্ত্রণালয় নিজস্ব অর্থায়নেই এ প্রকল্পের কাজ শুরু করছে। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি সাংবাদিক-সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবির সরকারি এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে স্বস্তিকা প্রতিনিধিকে বলেছেন, ইসলামি বিধানে সরকারি অর্থে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের সুযোগ নেই। ইসলামে বলা হয়েছে, সাধারণ জনগণের (কওম) অর্থে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ ও পরিচালিত হবে। সরকার এতে হাত দিতে পারবে না। তিনি বলেন, সৌদি আরবে ওয়াবি-সালাতিরা ইসলামি বিধান ভেঙে সরকারি অর্থে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ শুরু করে। পরে এই ধারা তুরস্কেও চলে যায়। এখন বাংলাদেশেও এই ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা ইসলাম অনুমোদন করে না। তাঁর মতে, সবই ক্ষমতা ও রাজনীতির কারণে হচ্ছে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করবে গণপূর্ত অধিদপ্তর। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে ২০২০ সাল পর্যন্ত। ৬৪টি জেলা সদর ও পাঁচটি সিটি করপোরেশনে চারতলা বিশিষ্ট এবং ৪৭৫টি উপজেলা সদরে তিনতলা বিশিষ্ট মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এছাড়া উপকূলীয় ১৬টি এলাকায় নীচতলা ফাঁকা রেখে চারতলা বিশিষ্ট মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। জানা গেছে, মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন রকমের নাগরিক সুবিধারও ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকার মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নীচতলায় দুর্যোগের সময় 'সাইক্লোন সেন্টার' হিসেবেও ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে। মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে মোট ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৪০

জন পুরুষ এবং ৩১ হাজার ৪০০ জন মহিলার নমাজ পড়ার সুবিধা রাখা হচ্ছে। কোরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে ৩৪ হাজার পাঠকের জন্য লাইব্রেরির সুবিধা রাখা হয়েছে। এসব লাইব্রেরিতে প্রতিদিন ৬ হাজার ৮০০ গবেষক গবেষণা করতে পারবেন। প্রতিদিন ৫৬ হাজার মুসলিম দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধাও থাকবে। প্রতি বছর ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর কোরআন হিফজ করার সুবিধা ছাড়াও ১৬ হাজার ৮০০ শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থাও রাখা হবে। ২ হাজার ২৪০ জন দেশি-বিদেশি অতিথির আবাসনের সুবিধাও থাকবে এসব কেন্দ্রে। মৃতদেহ স্নানের ব্যবস্থা ছাড়াও হজযাত্রী ও ইমামদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোতে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সূত্র আরও জানায়, বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষ মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদের সিংহভাগই স্থানীয় জনগণের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে উন্নত মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ছিল। ২০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় ওই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে লাইব্রেরি, গবেষণা কক্ষ, ইসলামি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, শিশু শিক্ষা কার্যক্রম, পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক নমাজ কক্ষ, দেশি-বিদেশি মেহমানদের আবাসন ব্যবস্থা, মৃতদেহ স্নানের ব্যবস্থা, হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদি সুবিধা সংবলিত মডেল মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৬ সালে জুনে সৌদি আরব সফরে গিয়ে সৌদি বাদশাহর সঙ্গে আলোচনায় দেশব্যাপী মডেল মসজিদ নির্মাণের বিষটি তুলে ধরেন তিনি। এরপর সৌদি সরকার এ প্রকল্পে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। পরে ২০১৭ সালের ২৫ এপ্রিল এ প্রকল্পের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) ৯ হাজার ৬২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৮ হাজার ১৬৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা সৌদি সরকারের দেওয়ার কথা। বাকি ৮৯২ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা খরচ করার কথা বাংলাদেশ সরকারের।

সূত্র জানায়, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদিত হওয়ায় এ প্রকল্পে সৌদি অর্থায়নের বিষয়টি অজ্ঞাত কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক মহাম্মদ আব্দুল হামিদ জমাদ্দার বলেন, সৌদি আরব অর্থ দেবে না— এমন কোনও কথা তারা এখনও বলেনি। আমরা এখনও আশাবাদী তারা এ প্রকল্পে অর্থ সহায়তা দেবে। তিনি আরও বলেন, আমরা নিজস্ব অর্থায়নেই মডেল মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করে দিয়েছি। এ মাসেই ঢাকা-সহ দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ১০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হবে। এ বছরের মধ্যেই এসব মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু করার ভাবনা রয়েছে। ■

কাশ্মীরের অস্থিরতার মূলে নেহরুর ভাবনা

ইদানীং জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সীমান্ত লঙ্ঘনের এবং জঙ্গি অনুপ্রবেশের ঘটনা নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার। আজ আমাদের সেনাবাহিনী সীমান্তে এই উভয় প্রকার ঘটনা রুখতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না, সর্বশক্তি দিয়ে সেনাবাহিনী সেসব ঘটনা মেকাবিলা করে যাচ্ছে। একসময় জম্মু ও কাশ্মীরে মুসলমান জনসংখ্যা বেশি হলেও হিন্দু ও বৌদ্ধরা নগণ্য ছিল না। কাশ্মীর আজ হিন্দুশূন্য, লাদাখে অবশিষ্ট বৌদ্ধদের অহরহ সীমান্ত সংঘর্ষে এবং কাশ্মীরের মুসলমানদের ব্যাপকহারে অনুপ্রবেশের ফলে টিকে থাকাই আজ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু চোখ ফিরালে আমরা কী দেখতে পাব? জম্মু-কাশ্মীরের ৩৭ শতাংশ পাকিস্তানের দখলে আর ২০ শতাংশ চীনের দখলে, যার গালভরা নাম আকসাই চীন। চীনের এই জবর দখল পণ্ডিত নেহরুর উপলব্ধিতে ছিল বলে মনে হয় না। আজকের কংগ্রেস নেতৃত্ব এ ব্যাপারে উদাসীন আর কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এবং ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক দলের নেতৃবৃন্দ চীনের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা চীনের এই লাগামছাড়া বিশ্বাসঘাতকতার শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান নিছক ক্ষমতার বলদর্পে জন্মলগ্ন থেকে কাশ্মীরের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছে এ চিন্তা করা মূর্খামি হবে। ভারতভাগের পর প্রতিটি ধাপে নেহরু এবং কংগ্রেস কাশ্মীরি মুসলমানদের মানসিকতার পরিচয় সন্ধানে 'হিমালয় প্রমাণ' ভুল করে গেছেন। নেহরু নব্যসৃষ্ট পাকিস্তান-লাগোয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীরকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রথম পরীক্ষাগার করেছিলেন, বিনিময়ে নব্যসৃষ্ট পাকিস্তান দু-মাস পরে কাশ্মীর আক্রমণ করে বসে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয় এবং তাদের কাশ্মীর থেকে তাড়া করে পাকিস্তানে আমাদের সেনাবাহিনী যখন ঢুকে পড়ে তখন কোনও চুক্তি না করে যুদ্ধবন্ধের আদেশ দিয়ে বিবাদটি রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিয়ে যায়। ফলস্বরূপ কাশ্মীরে পাকিস্তান পুনরায় সীমান্ত লঙ্ঘন করে ৩৭ শতাংশ দখল করে বসে।

১৯৪০ সালের ২১ জুন শ্রীঅরবিন্দের কাশ্মীর বিষয়ক একটা সতর্কবার্তা ছিল— 'কাশ্মীরে সকল একাধিকার হিন্দুদেরই। এখন যদি মুসলমানদের দাবিগুলি গৃহীত হয়, তাহলে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' ভাবুন ভারতভাগের অনেক আগেই শ্রীঅরবিন্দের এই সাবধানবাণী কতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল। নেহরুর এই বালখিল্য আচরণে তৎকালীন বৃটিশপ্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আমাদের উদ্দেশ্যে কার্যত 'অভিসম্পাত' করেছিলেন যে, উপমহাদেশের এই তথাকথিত স্বাধীনতাটুকু একদিন লুপ্ত হবে কিছু অপগণ্ড (চার্চিলের ভাষায় --- ম্যান অব স্ট্র) রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে বসে দেশটার বরবাদ করে ছাড়বে।' (তথ্য : বর্তমান ৮/১৭)। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৭০ ধারা নেহরুর মস্তিষ্ক প্রসূত ছিল। ধারাটি অস্থায়ী বিধান ছিল। ১৯৫৭ সালে কাশ্মীরে সাংবিধানিক পরিষদ ভঙ্গ হলে ধারাটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, নেহরুর একান্ত ইচ্ছায় আজও বলবৎ।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

মহাত্মার অহিংসার বাণী

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে রাজ্যের সাম্প্রতিক হিংসার আবহে মহাত্মার অহিংসার বাণী প্রচারে উদ্যোগী হবেন রাজ্য সরকার। সরকারের নিকট আমার আবেদন মহাত্মার নিম্নলিখিত বাণীগুলো যাতে প্রচার করা হয়।

নোয়াখালিতে ৪৬-এর হিন্দু নিধনের পর সেখানে গিয়ে তিনি হিন্দুদের পরামর্শ দিলেন, তাঁরা যেন বীরের মতো পবিত্র মনে মুসলমানদের তরবারির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। পঞ্জাবের ধর্ষিতা মহিলাদের তিনি উপদেশ দিয়েছেন তাঁরা যেন জিহ্বায় কামড় দিয়ে ধর্ষণের জ্বালা আর অপমান সহ্য করে নেন। বাধা দেওয়া চলবে না।

নোয়াখালিতে ধর্ষিতা ও অপহৃতা মেয়েদের কাছে মহাত্মার আহ্বান তাঁরা যেন তাঁদের অত্যাচারীদের বাধা না দেন। কারণ মেয়েদের জানা উচিত কীভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সুতরাং খুবই সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। এবং একটুও শোক করা উচিত নয়। কেবল তা হলেই তাদের উপর এই অত্যাচার, ধর্ষণ ও অপহরণ বন্ধ হবে। তিনি মহিলাদের আরও আহ্বান জানালেন ধর্ষণে বাধা না দিয়ে তা সহ্য করতে। তাহলেই ধর্ষণ করতে করতে ধর্ষণকারীর কুপ্রবৃত্তি রহিত হবে। হিন্দুদের তিনি উপদেশ দিলেন "To get killed but not to kill". মুসলমান ধর্ষক এবং হিন্দু ধর্ষিতা মহিলাদের মহাত্মার দুটো উপদেশ এখানে তুলে ধরছি। (১) যদি কোনও মুসলমান আমার ঘরে ঢুকে আমার বোনকে ধর্ষণ করতে থাকে তবে আমি সেই মুসলমানের পায়ে চুমু খাবো (তথ্য : নবজীবন ৬-৭-১৯২৬) (২) যদি কোনও মুসলমান কোনও পঞ্জাবি মহিলাকে ধর্ষণ করতে চায় তবে তার উচিত হবে সেই মুসলমানের সঙ্গে সহযোগিতা করা। দাঁতের মধ্যে জিভ কামড়ে মরার মতো পড়ে থাকা (Ref Freedom at Midnight ল্যাপিয়ের এবং কলিন্স, vikas p. 479).

স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে মহাত্মা যখন কলকাতায় মুসলমানদের রক্ষাকল্পে বেলেঘাটার হায়দরি মঞ্জিলে অবস্থান করছিলেন, তখন জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক এসে বললেন, ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে তার ছেলেকে মুসলমানরা খুন করেছে। তার এখন কী কর্তব্য? মহাত্মার উপদেশ— তার কর্তব্য একজন দুঃস্থ মুসলমান ছেলেকে নিজের সন্তানের মতো মানুষ করা।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত,
কলকাতা-৬৪।

বহিঃশত্রুর থেকে ভিতরের ছদ্মবেশী শত্রুরা বেশি বিপজ্জনক

সৌদামিনী চট্টোপাধ্যায়

বহিঃশত্রু কে বা কারা, এখন আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ভিতরে যারা সারাক্ষণ নানাভাবে ভারতের অখণ্ডতা, ভারতের সংস্কৃতি— বলতে গেলে ভারতের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে তাদের চিনে নেওয়া দরকার। এরা নানাধরনের মুখোশ পরে থাকে, আমজনতা অনেক সময়েই এদের বিশ্বাস করে ধোঁকা খেয়ে যায়। আজ সময় এসেছে এদের চিনে নেবার।

একটি অদ্ভুত পরজীবী গোষ্ঠী আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যাদের বলা হয়ে থাকে বুদ্ধিজীবী। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিনোদন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, যেমন চলচ্চিত্র, টিভি সিরিয়াল ও মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, পরিচালক, কাহিনিকার, সঙ্গীতকার ও অন্যান্য কলাকুশলী। এছাড়া আছে কিছু স্বনামধন্য মিডিয়া গোষ্ঠী, আছেন বেশ কিছু মানবাধিকার ধ্বজাধারী, আর অবশ্যই এক বিরাট সংখ্যক ফরমায়েসি ইতিহাস লেখক, কবি ও সাহিত্যিক। এঁদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ছিটেফোঁটা নেই, 'ভারতীয়ত্ব' শব্দটি এঁদের কাছে বড়ই অর্থহীন এবং হাস্যকর। ভারতের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে এঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, রঙ্গ-রসিকতা সদা-সর্বদা উপচে পড়ে। বাবরি ধাঁচা নিয়ে আজও এরা অঝোরে কেঁদে চলেছে কিন্তু মন্দির ভাঙা হলে এঁরা টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করে না। এঁদের ধর্মনিরপেক্ষতা এতটাই সেলেক্টিভ যে আজ আর কাউকে বলে দিতে হয় না। মানুষ এখন এঁদের চিনতে শুরু করে দিয়েছে। এঁরা জুনেইদ, আখলাকের হত্যার জন্য সরব হয়। হত্যা কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সমর্থন করে না কিন্তু বসিরহাটের কার্তিক ঘোষ, কাসগঞ্জের চন্দন গুপ্তাদের হত্যা করা হলে এই সব বুদ্ধিজীবীর দল বোবা সেজে থাকে।

প্যালেস্টাইনে হতাহত মানুষদের জন্য এঁরা কত না অশ্রু বিসর্জন করেন। মোমবাতি মিছিল, সেমিনার, ওয়ার্কশপ করেন কিন্তু ঘরের পাশে বাংলাদেশ, যেখানে নিরীহ হিন্দু অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে চলেছে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছে, মেয়েরা বলাৎকারের শিকার হচ্ছে, পরিবারের পুরুষ সদস্যগুলিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে, পুরোহিতদের কুপিয়ে মারা হচ্ছে, কোনও মুক্তমনা, প্রকৃত অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান এইসব ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাকেও মেরে ফেলা হচ্ছে। কই, এপার বাংলার মানবদরদি বুদ্ধিজীবীদের কারও গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না তো? এইসব সুজাত ভদ্র, কণ্ডোমকবি শ্রীজাত, প্রগতিশীল কৌশিক সেন, প্রতিবাদী কবি শঙ্খ ঘোষ, 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' ঘোষণাকারিণী মিরাতুন নাহার প্রমুখ হিন্দু-নির্যাতনের সময় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকেন কেন? কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে উৎখাত করা হয়, তখন ভারতের সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবীর দল, জে এন ইউ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল যুবসমাজ, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ফেরত দেওয়া গোষ্ঠী, কমিউনিস্ট-কংগ্রেসিদের বিদ্বজ্জনরা মৌনীবাবা সেজে থাকেন কেন?

সেই গান্ধী-নেহরুর সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত স্বার্থান্বেষী অপরিণামদর্শী কংগ্রেসি, কমিউনিস্ট, লালু, মুলায়ম, মমতাদের বেপরোয়া মুসলমান তোষণ আজ দেশের হিন্দু জনসমাজকে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। ফলে হিন্দুরা একতাবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে। সেটা বুঝতে পেরেই ঘরের শত্রুরা ভয় পেয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি দলিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষ্যাপানো শুরু হয়েছে, কর্ণাটকের লিঙ্গায়েতদের হিন্দুসমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা করার চক্রান্ত হচ্ছে, ইংরেজের করা ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি আবার ঘরের শত্রুদের দ্বারা নতুন করে মাথাচাড়া দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গত করছে প্রো-পাকিস্তান কিছু খলনায়কের দল যেমন মণিশঙ্কর আয়ার, AIMIM দলের আসাদুদ্দিন ওয়েসি, রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাজিদ হায়দারি, ওয়ারিম পাঠান, শবনম লোন, আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণান, কুমার কেতকার প্রমুখ। অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের মধ্যে আছে কবিতা কৃষ্ণান, কানহাইয়া কুমার, ওমর খালিদ, জিগনেশ, অল্পেশ আর হার্দিক প্যাটেলদের ব্রিগেড। অরুন্ধতী রায়ের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। বলিউডের করণ জোহর, ইমতিয়াজ আলি, নন্দিতা দাস, জোয়া আখতার ইত্যাদিরা ভুলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করে না, অথচ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এরা লাগাতার বিষোদ্গার করে চলেছে। এদের পেছনে কে বা কারা আছে আমরা জানি না, তবে তাদের উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে যেন তেন প্রকারণে মোদীকে গদিচ্যুত করতে হবে।

এই কারণেই রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলি একজোট হবার চেষ্টা চালাচ্ছে। মোদী আসাতে তাদের অনেকেরই বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে, আরও ছাই যাতে না পড়ে।

কমিউনিস্টরা সারা ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কেরলে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। তাদের মদতপুষ্ট সংগঠন পি এফ আই জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমী মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করছে, মুসলমান তোষণের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে এ জিনিস দেখা যাবে না। আজ মুসলমান তোষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে কংগ্রেস, পি এফ আই, সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল এবং কমিউনিস্ট দলগুলি। এরা বহিঃশত্রু নয়। এরা ভিতরের শত্রু।

কাশ্মীরে পাকিস্তান চরম অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে চলেছে, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের টাকা পয়সা দিয়ে পাথর ছোঁড়া বাহিনী বানিয়েছে। মেহবুবা মুফতি থেকে আরম্ভ করে ফারুক আবদুল্লা ওমর আবদুল্লার দল পাথর ছোঁড়াবাহিনীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

যারা দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করে না, অথচ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমীদের সমালোচনায় সর্বদাই মুখর, যারা পরোক্ষে দেশের বহিঃশত্রুদের হাত শক্ত করে, তারা ঘরের শত্রু। এদের মুখোশ খুলে যাচ্ছে। ক্রমশ মানুষ সচেতন হতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যেদিন ভারতের মানুষ সমবেতভাবে এদের প্রত্যাখ্যান করবে, সেদিন এই সব স্বার্থান্বেষী, দেশ বিরোধী মানুষগুলি পালাতে পথ পাবে না। ■

মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার

সৌমী দাঁ

আগের পর্বে মেয়েদের 'সম্পত্তির অধিকারে' বিয়ের আগে ও পরে বাবার সম্পত্তিতে তাদের অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এবারের বিষয় স্বামীর সম্পত্তিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের অধিকার নিয়ে।

বিয়ে রেজিস্ট্রি হওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই স্বামী ও স্ত্রী রূপে সমাজে স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বিয়ের পর মেয়েটি আসে তার শ্বশুরবাড়িতে এবং সেখানকার এক অংশ হয়ে যায়। শ্বশুরবাড়িতে আসার পর মুহূর্ত থেকেই সবকিছুর ওপরে তার আইনি অধিকার চলে আসে। শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ তাকে বেআইনি ভাবে উচ্ছেদ করতে পারে না।

স্বামীর স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির ওপরে স্ত্রীর সমান অধিকার। এক্ষেত্রে স্ত্রীর নিজস্ব রোজগার থাক বা না থাক স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

ডিভোর্সের পর স্বামীর সম্পত্তিতে মেয়েটির অধিকার :

এক্ষেত্রে ডিভোর্সের কারণের ওপর এবং স্বামীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের ওপরে খোরপোশ ব্যাপারটি কিছুটা নির্ভর করে।

যদি কোনও মহিলা (সন্তান নেই ও চাকরিহীন) স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে স্বামীর ঘর ও শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন বা তাকে জোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে সেই বিতাড়িত মেয়েটি কিছু আইনি সুবিধার অধিকারী।

(১) মেয়েটি বাপের বাড়ি ফিরে আসতে পারেন এবং সেখানে থেকে ভরণপোষণের মামলা করে খোরপোশ পেতে পারেন।

(২) তিনি Restoration of conjugal

life বা বিবাহিত জীবন ফিরে পেতে মামলা করতে পারেন। আবার ডিভোর্স চাইতে পারেন এবং মামলা চলাকালীন সেই মেয়েটি অ্যালিমনি চেয়ে মামলা করতে পারেন। এমনকী সেই ক্ষেত্রে ভরণপোষণের সঙ্গে মামলা চালানোর খরচও দাবি করতে পারেন।

(৩) ডিভোর্স হয়ে গেলেও মেয়েটি হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী অ্যালিমনি পেতে পারেন।

(৪) যতদিন না পুনর্বিবাহ করছেন ততদিন স্বামীর আর্থ ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী খোরপোশ পাবেন।

(৫) মেয়েটি যখন নির্যাতিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসছেন বা বিতাড়িত হচ্ছেন তার যদি অন্য কোনও বাসস্থান না থাকে সেক্ষেত্রে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইনে তিনি আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। এই আইনের আওতায় মেয়েটি সুরক্ষা পাবেন। এই আইনে মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে থেকেই মামলা করতে পারেন। এক্ষেত্রে আদালত তার বাসস্থান জনিত সমস্যার সমাধান করেন ও প্রোটেকশন অফিসার দ্বারা সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

অঙ্গনা

(৬) মেয়েটি স্ত্রী-ধন অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া সমস্ত জিনিস ফেরত পাবেন। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাধা দিলে আইনি ব্যবস্থা আছে, মামলা করতে পারেন ও পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন।

(৭) যদি কোনও মেয়ের মিউচুয়াল কনসেন্ট বা সমঝোতার মাধ্যমে ডিভোর্স হয় তিনি এককালীন খোরপোশ দাবি করতে পারে।

চাকরিহীন কোনও মহিলা যদি সন্তান সমেত নির্যাতিত হয়ে শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন বা বিতাড়িত হন সেক্ষেত্রে মেয়েটি বাপের বাড়িতে থেকে নিজের ও সন্তানের ভরণপোষণের মামলা করতে পারেন। বিবাহিত জীবন ফিরে পাবার বা ডিভোর্সের মামলা করতে পারেন। মামলা চলাকালীন ভরণপোষণের সঙ্গে মামলা চালানোর খরচও দাবি করতে পারেন। স্ত্রী-ধন ফেরত পেতে মামলা করতে পারেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাধা দিলে পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও স্বামী যদি স্ত্রী ও সন্তানকে ফিরিয়ে না নিতে চায় ডিভোর্স চেয়ে নিজের ও সন্তানের খোরপোশের দাবি করতে পারেন।

শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হবার পর যদি সন্তান-সহ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন মেয়েটি সেক্ষেত্রে গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইনে আর্থিক সুবিধা ও ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। এই আইনে মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে থেকেই মামলা করতে পারেন। এই আইনে প্রোটেকশন অফিসার দ্বারা মেয়েটির সুরক্ষা ও বাসস্থানজনিত সমস্যার সমাধান করা হয়। মিউচুয়াল কনসেন্টের ডিভোর্সে মেয়েটি তার ও সন্তানের এককালীন ভরণপোষণ পাবেন। মেয়েটির পুনর্বিবাহ হলে ভরণপোষণ বন্ধ হলেও সন্তানের দায়িত্ব বাবাকে বহন করতে হবে।

(লেখিকা একজন আইনজীবী)

সর্বরোগে পাতিলেবু

সত্যানন্দ গুহ

বর্ষাকালে ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র কোথাও ঠাঁই নেই। ঘরে ঘরে আমাশা, জ্বর, জন্ডিস, বদহজম,অম্বল, গ্যাস, টাইফয়েড, আন্ত্রিক, আরও কত অসুখ বিসুখের রাজত্ব এই সময়। সব রোগের কারণ একটাই — পেটের গণ্ডগোল। পেট ঠিক থাকলে সাধারণত এই রোগগুলি হয় না। পেট ভালো রাখতে গেলে লিভার ঠিক রাখতে হয়। আর লিভার ভালো থাকলে হার্ট, কিডনি, ফুসফুস সক্রিয় ও সতেজ থাকে। একটি কী দুটি পাতিলেবু এসবের মুশকিল আসান করতে পারে। নোবেলজয়ী অধ্যাপক ফার্ম মুলার মন্তব্য করেছেন — লেবু রোগ প্রতিষেধক এবং আরোগ্যকারক। লেবুতে প্রচুর ভিটামিন সি থাকে, যা শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ভিটামিন সি শরীরে উৎপন্ন হয় না বা শরীরে সঞ্চিত থাকে না। শাকসবজি, ফলমূলের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। লেবু জাতীয় ফলেই ভিটামিন সি বেশি থাকে। লেবুর মৃদু সাইট্রিক অ্যাসিড পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে ক্ষারধর্মী হয়। সোডিয়াম বাই-সাইট্রেট উৎপন্ন করে। প্রাকৃতিক চিকিৎসকরা, খাদ্যবিজ্ঞানীরা খালিপেটে নুন চিনি বাদে লেবুজল খেতে বলেন। এতে পাকস্থলীর অম্লত্ব কমে যায় ও হজমের সহায়ক হয়। মিষ্টি, ঝাল, তৈলাক্ত জাতীয় খাদ্য পাকস্থলীতে অম্ল উৎপাদন করে বিপর্যয় ডেকে আনে। কিন্তু পাতিলেবু বা লেবুজাতীয় ফল অম্লত্ব কমিয়ে ক্ষারত্ব বাড়িয়ে দেয়— যা সুস্থ শরীরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

তবে পাতিলেবু কোনও খাদ্যবস্তুর সঙ্গে বা ভাতের পাতে বা কোনও কিছু খেয়ে উঠেই খেতে নেই। ভাত, রুটি ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে লেবু খেলে পাকস্থলীতে অত্যধিক টক্সিন উৎপন্ন হয়।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পাতিলেবুকে সর্বরোগহর বনৌষধি বলা হয়েছে। ধন্বন্তরী একে অমৃতফল বলেছেন। অন্য

কোনও ফলে এত গুণ নেই। ডাঃ উইলসন লেবুকে অদ্বিতীয় ফল বলেছেন। রক্তে অম্লত্ব বাড়লেই নানা রোগের শিকার হতে হয়। পাতিলেবু অম্লত্ব কমিয়ে দেয়। বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য পেটের যাবতীয় রোগ দূর করে। খিদে বাড়ায়, জীবাণু ধ্বংস করে এবং ক্লান্তি দর করে। বায়ু, পিত্ত ও কফ্ বিকৃত হতে দেয় না। শুধু তাই নয়, চুল ওঠা বন্ধ করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, ব্রণ নাশ করে, রক্তের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। আজকাল লেবু দিয়ে হরেকরকমের প্রসাধনী বের হয়েছে।

ভিটামিন সি রোগ নিরোধক ও রোগারোগ্য মূলক এবং শরীরের ক্যালসিয়ামকে ধাতস্থ করতে সাহায্য করে। পিত্ত পাথুরি, বৃক্ক পাথুরি, ডায়াবেটিস, বাত, চর্মরোগে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক আর নেই। স্থূল ব্যক্তি মেদ কমাতে পারে। ঘামাচি, কাটা, ছেঁড়া, চুলকানি, ব্যথায় বাহ্যিক ব্যবহার করা যায়। চুলের দীপ্তি বাড়ায়। টনসিল, গলগণ্ড, পাইওরিয়া, খুসকি ভাল হয়।

মনে রাখতে হবে, সূর্যাস্তের পর লেবু খাওয়া চলবে না। লেবু কেটে ফেলে রাখা চলবে না। সবুজ লেবুর চেয়ে হলুদ লেবু (পাকা) বেশি উপকারী।

কখন কীভাবে খেতে হবে :

শুধু লেবু খেলেই হবে না। কখন কীভাবে খেতে হবে তা জানা চাই। অন্যথায় হিতে বিপরীত হবে। ভাতের পাতে ডালের সঙ্গে মাছ মাংস খাওয়ার পরে লেবু খেতে ভালো লাগলেও না খাওয়াই ভালো। শক্ত খাদ্যকে লেবুর রস তরল করে দিলেও পরিণামে বিষাক্ত টক্সিন বা অম্ল উৎপন্ন করে। লেবু-চা খেলেও অম্ল বাড়বে এবং রক্তের হিমোগ্লোবিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই লেবু-চা পান অনুচিত। সকালে এক কাপ বা অর্ধগ্লাস জলের সঙ্গে একটি বা দুটি লেবুর রস খেতে হবে। প্রতিদিনই খেতে হবে। রোগের আধিক্য থাকলে দিনে ২/৩ বার খেতে হবে। নুন চিনি গুড় ইত্যাদি কিছুই মেশানো চলবে না। ঠাণ্ডা জলই প্রশস্ত। জ্বর হলে ঈষদুষ্ণ জলে পান করা যায়। লেবুজল খেয়ে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট আগে-পরে কিছু খাওয়া চলবে না। চীনা মাটির পাত্র, পাথরের পাত্র বা কাঁচের পাত্র ছাড়া অন্য কোনও ধাতু পাত্রে খাওয়া ক্ষতিকর। সকাল থেকে বেলা ৩-৪ টার মধ্যে খেতে হবে। সন্ধ্যার পর রাতে লেবু খাওয়া নিষেধ। লেবু কেটেই সঙ্গে সঙ্গে লেবুর রস জলে মেশাতে হবে। শ্বেতসার, শর্করা বা অন্য কোনও লবণ ও ভিটামিনের সঙ্গে লেবু খাওয়া চলবে না। স্যালাড, শাকসবজির সঙ্গে লেবু রস মেশানো শরীরে অম্লের ভাগ বেড়ে যাবে এবং নানা রোগ আক্রমণ করবে। কোনও টক ফলই রান্না করে, গরম করে এবং নুন, চিনি, মিষ্টি মিশিয়ে খেতে নেই।

অধিকাংশ বাঙালি অ্যাসিডিটি ও গ্যাস্ট্রিক রোগে ভোগেন। লেবুর সম্যক ব্যবহারই রক্তে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করে মুক্তি দিতে পারে। অম্লফলের মধ্যে, পাতিলেবুর মতো রোগ প্রতিরোধক ও রোগ নিরাময়কারী আর কিছু নেই। এককথায় 'সর্বরোগহর সর্বৌষধি'।

(লেখক প্রাকৃতিক চিকিৎসক)

পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতার অলিন্দে কংগ্রেস

চন্দ্রভানু ঘোষাল

তাঁদের দল প্রায় পনেরো বছর ক্ষমতার বাইরে। এত বছর ক্ষমতার বাইরে থাকলে অধিকাংশ দলই ভেঙে যায়। সম্ভবত দেবেগৌড়া এবং কুমারস্বামীও এরকম আশঙ্কাই করে থাকবেন। তার ওপর এবারের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদের দল পেয়েছে মাত্র আটত্রিশটি আসন। এই অবস্থায় রাহুল গান্ধীর প্রস্তাব পায়ে ঠেলার সাহস দেখাতে পারেননি জেডিএস সুপ্রিমো এবং তাঁর পুত্র কুমারস্বামী। সত্যি কথা বলতে কী, আটত্রিশটা আসন সম্বল করে কেই বা মুখ্যমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখতে পারে! বস্তুত কর্ণাটকের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পর জেডিএস এবং কংগ্রেস যেভাবে ক্ষমতা ভাগাভাগি করছে তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার, জোট গড়ার আগে এই দুটি দল কোনও আদর্শ বা ন্যায়নীতির ধার ধারেনি। জনাদেশকেও পদদলিত করেছে নির্মমভাবে। এই জোটের কারণ মূলত দুটি, কুমারস্বামীর মুখ্যমন্ত্রী হবার লোভ এবং রাহুল গান্ধীর বিজেপিকে যেন তেন প্রকারে আটকে রাখার জেদ।

সাম্প্রতিককালের কংগ্রেসি রাজনীতিতে চোখ বোলালে বোঝা যাবে যেভাবে হোক বিজেপিকে আটকানোই দলটির লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন ছিল পঞ্চদশ নির্বাচন। এই পর্বে বিজেপি একটির পর একটি নির্বাচনে জিতে বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। কখনও একক ভাবে কখনও নির্বাচনী জোট গড়ে। কর্ণাটকেও বিজেপির জয় একরকম নিশ্চিত ছিল। ম্যাজিক ফিগারের থেকে মাত্র আটটি আসন দূরে থেমে যায় বিজেপির বিজয়রথ। আর এই সামান্য ফাঁক কাজে লাগিয়ে এগিয়ে আসে কংগ্রেস। শতবর্ষপ্রাচীন দলটির আদর্শ এবং ঐতিহ্য ধুলোয় মিশিয়ে স্রেফ ক্ষমতার জন্য জেডিএসের মতো আঞ্চলিক দলের পায়ে পড়ে যেতে বাধেনি। দেশের মানুষ ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই কংগ্রেসের দুই প্রবীণ নেতা গুলাম নবি আজাদ এবং অশোক গেহলট জেডিএসকে নিঃশর্ত সমর্থনের কথা জানিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, কুমারস্বামীর বহু আকাঙ্ক্ষিত মুখ্যমন্ত্রীর পদটিও তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের এই আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সারা দেশ। অনেকেরই প্রশ্ন, একসময় যে দলের বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেছেন বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মতো নেতা, সেই দল কীভাবে শুধু ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য একদল অসামাজিক মানুষের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে? তাদের প্রশ্ন, যে দল প্রায় ছয় দশক নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে লোকসভা পর্যন্ত সর্বত্র স্বমহিমায় বিরাজমান ছিল তারা কীভাবে শুধু একটি বিশেষ পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেশের কয়েকটি কোণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে? কংগ্রেসের ভাবগতিকে দেখে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, যে ঐতিহ্য এবং আদর্শের কথা কংগ্রেস একসময় বলত, সেসব নিয়ে তারা এখন আর মাথা ঘামায় না, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই তাদের এখন সবচেয়ে বড়ো মাথাব্যথা। মুশকিল হলো, ২০১৪ সালের পর দেশের মানুষের রাজনৈতিক মননশীলতার যে পরিবর্তন ঘটে গেছে কংগ্রেস সেটা বুঝতে পারেনি। তথ্যভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য কংগ্রেস যে-কোনও পরিবর্তনের বিরোধী। আর বিজেপি পরিবর্তনের দিশারি দল। তাই কংগ্রেসের ক্রমিক অবনমন এবং বিজেপির উত্থান— এটা সময়েরই দাবি।

কংগ্রেসমনস্ক কেউ কেউ বলছেন কর্ণাটকের ফলাফলে প্রমাণিত মোদী আর অপ্রতিরোধ্য নন। অমিত শাহও নন চাণক্য। এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে, কর্ণাটকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজেপিই কিন্তু জিতেছে। তাতে মোদীর অপ্রতিরোধ্যতা প্রমাণিত হয়েছে নিশ্চয়ই। বিশেষ করে কংগ্রেসেরই কোনও কোনও নেতা যেখানে স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোটের প্রচারে অংশ নেবার পর থেকেই ছবিটা বদলাতে শুরু করে। সুতরাং কর্ণাটকে বিজেপি কোনওভাবেই হারেনি। কংগ্রেসই পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে।

কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে কর্ণাটক

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কর্ণাটক বিধানসভার অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বিজেপি আসন সংখ্যার নিরিখে একক বৃহত্তম দল হিসাবে ওই রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজেপি পেয়েছে ১০৪টি আসন। অপরপক্ষে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কর্ণাটকে শুধু যে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তা নয়, কংগ্রেসের আসন সংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছে। তারা পেয়েছে ৭৮। তৃতীয় স্থানে রয়েছে দেবেগৌড়ার নেতৃত্বাধীন জনতা দল সেকুলার বা জেডিএস। তাদের আসন সংখ্যা ৩৮। জেডিএসের আসনও গতবারের তুলনায় কমেছে। দুটি আসনে নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এই লেখা যখন লিখছি, সেই সময় রাজ্যপালের আমন্ত্রণে বিজেপি সরকার গড়ছে। শপথ নিয়েছেন বিজেপি পরিষদীয় দলনেতা ইয়েদুরাপ্পা। রাজ্যপাল ইয়েদুরাপ্পাকে নির্দেশ দিয়েছেন, ১৫ দিনের ভিতর বিধানসভায় নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে। এরই মাঝে কংগ্রেস সরকার গড়ার থেকে অনেক কম আসন পেয়েও জেডিএসকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করার একটা মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিল। রাজ্যপাল তাদের আর্জি খারিজ করে ইয়েদুরাপ্পাকে সরকার গঠন করার আমন্ত্রণ জানানোয় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কংগ্রেস। তবে এক্ষেত্রে আদালতের বিশেষ কিছুই করার নেই। নিয়ম অনুযায়ী বিধানসভায় বৃহত্তম দলকেই প্রথম সরকার গড়ার আমন্ত্রণ জানানোর কথা। রাজ্যপাল সংবিধান মেনে সে কাজটিই করেছেন। এরপর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের দায় ইয়েদুরাপ্পার। তার জন্য দুটি সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

এবারের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন নানা কারণেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথম, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি এবং কংগ্রেস দুই দলের কাছেই ছিল এটি অ্যাসিড টেস্ট। কংগ্রেসের লাগাতার কুৎসা এবং অপপ্রচারের জবাবে বিজেপির এটি প্রমাণ করার দরকার ছিল যে, বিজেপি, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গ্রহণযোগ্যতা এখনও কমেনি। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে কর্ণাটকে ভালো ফল করে বিজেপির এটাও প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল যে, শুধু উত্তর ভারত বা দেশের পশ্চিমাঞ্চল নয়, দক্ষিণ ভারতেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। অন্যদিকে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন ছিল তাঁর কাছে সবথেকে বড় অগ্নিপরীক্ষা। কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে পারলে জাতীয় রাজনীতিতে রাহুল তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়াতে পারতেন। জোটের নেতা হিসাবে তাঁকে মেনে নিতে কারও দ্বিধা হতো না। এছাড়াও, দলে তাঁর নেতৃত্বও আরও শক্ত হতো। সর্বোপরি ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেওয়া যেত। কিন্তু ফল বেরুলে দেখা গেল, রাহুলের সমস্ত আশায় জল পড়েছে। কর্ণাটকেও বিজয়ীর হাসিটি হেসেছেন নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের জুটি।

অথচ এই কর্ণাটকে জেতার জন্য রাহুল গান্ধী কীই না করেছেন। গত কয়েক মাস আগে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাওয়ার পর পরই কর্ণাটকের ময়দানে নেমে পড়েছিলেন রাহুল গান্ধী। যে সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, সেই সিদ্দারামাইয়ার ওপর ভর করে, তাঁকেই দলের মুখ করে কর্ণাটকে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। গত বিহার বিধানসভা নির্বাচন থেকে যদি কেউ লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন, নির্লজ্জ জাত-পাত-বর্ণের রাজনীতি উসকে দিয়ে কংগ্রেস সব জায়গায় ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সোনিয়া এবং রাহুলের আমলে কংগ্রেস যেভাবে জাতপাতের রাজনীতির ঘৃণ্য খেলাটি খোলাখুলি খেলেছে, ইতিপূর্বে কংগ্রেসের কোনও নেতৃত্বই তা খেলেননি। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে হার্দিক প্যাটেল, জিগ্নেশ মেভানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসকে জাতপাতের এই ঘৃণ্য রাজনীতি খেলতে দেখা গেছে। কিন্তু সে খেলায় গুজরাটে খুব লাভবান হয়নি কংগ্রেস। সেই একই নোংরা খেলা কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনেও খেলতে চেয়েছিল কংগ্রেস। নির্বাচনের আগে কর্ণাটকের প্রাক্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া লিঙ্গায়েত গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করে তাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। এই ঘোষণার পিছনে কংগ্রেসের কয়েকটি নোংরা উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, লিঙ্গায়েতদের সংখ্যালঘু ঘোষণা করে হিন্দু ভোটটিকে বিভাজন করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, যে লিঙ্গায়েত গোষ্ঠী বরাবরের বিজেপি সমর্থক তাদের সংরক্ষণের টোপ দেখিয়ে বিজেপির কাছ থেকে সরিয়ে আনা। ফল বেরলে দেখা গেল, কংগ্রেসের এই নোংরা জাতপাতের খেলা কর্ণাটকের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। হাজার প্রলোভন সত্ত্বেও লিঙ্গায়েত ভোটের গরিষ্ঠাংশ বিজেপিকে ছেড়ে যায়নি। কর্ণাটকের নির্বাচনের প্রচার পর্বে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস দলিত তাস খেলারও চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা লাগাতার প্রচার চালিয়ে

গিয়েছেন যে, সঙ্ঘ পরিবার দলিত বিরোধী। নরেন্দ্র মোদীর আমলেই দলিতদের ওপর সব থেকে বেশি অত্যাচার হয়েছে— কংগ্রেসের এ প্রচারেও যে আদৌ কোনও কাজ হয়নি, ভোটের ফল বেরনোর পর তাও প্রমাণ হয়েছে। খোদ দলিতরাই কংগ্রেসের এই প্রচারে কান দেয়নি। কর্ণাটকে দলিতদের একটা বড় অংশের সমর্থন এবার এসেছে বিজেপির প্রতি। এর পিছনে অবশ্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বেশ কয়েকবছর ধরে দলিতদের সামাজিক স্বীকৃতি এবং তাদের উন্নয়ন কল্পে সঙ্ঘ যে নিরলস কাজ করে চলেছে, তারই ফল এবার কর্ণাটকে পেয়েছে বিজেপি।

আরেকটি অতীব ক্ষতিকারক এবং নোংরা খেলা কংগ্রেস এবার কর্ণাটকে খেলেছে। রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস কর্ণাটকের নির্বাচনে এবার আঞ্চলিকতাবাদের আবেগকে উসকে দিয়েও রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা করেছেন। রাহুল এবং কংগ্রেস নেতারা এবার নির্বাচনী প্রচারে বারবার বিজেপিকে উত্তর ভারতের দল এবং নরেন্দ্র মোদীকে বহিরাগত বলে প্রচার করেছেন। ভারতেরই একটি প্রদেশে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে কখনও বহিরাগত হতে পারেন না, সে বোধবুদ্ধিই আসলে রাহুল বা কংগ্রেস নেতাদের নেই। যে যুক্তিতে এরা নরেন্দ্র মোদীকে বরিহাগত বলেছেন, সেই একই যুক্তিতে যে রাহুল গান্ধীও বহিরাগত— সে বোধটুকুও এদের কাজ করেনি। ভোটের ফল বেরলে দেখা গিয়েছে, কংগ্রেসের এই উগ্র আঞ্চলিকতাবাদের রাজনীতিকেও কর্ণাটকের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। ফল বেরনোর পর প্রধানমন্ত্রী তাই বলেছেন, 'প্রমাণ হলো বিজেপি শুধু উত্তর ভারতের দল নয়, দক্ষিণ ভারতেরও দল।' আর একটি চিরাচরিত কার্ড কংগ্রেস কর্ণাটক নির্বাচনেও খেলেছে। তা হলো মুসলিম কার্ড। কর্ণাটক নির্বাচনের আগে মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্দেশে কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ সরাসরিই কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। টিপু সুলতানের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালনের ইস্যুটিকে পাকিস্তানের সমর্থনে সামনে এনেও মুসলমান ভোট জয় করার চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেস নেতারা। কংগ্রেসের এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে জেহাদি মৌলবাদী মুসলমানরা উৎসাহী হতে পারে। তাদের সমর্থনও পেতে পারে কংগ্রেস। কিন্তু ফলাফলে দেখা গেছে, এই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে কর্ণাটকের মানুষ সমর্থন করেনি।

কর্ণাটকের নির্বাচন বাস্তবিক অর্থেই রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সামনে বড় প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। একের পর এক নির্বাচনী ব্যর্থতায় এবার প্রশ্ন উঠবেই, ২০১৯ সালে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে নরেন্দ্র মোদী নামক ব্যক্তিত্বের মোকাবিলা করতে কি পারবে কংগ্রেস? কংগ্রেস নেতা-কর্মীরাও আর কতটা ভরসা রাখতে পারবেন রাহুল গান্ধীর ওপর সে সংশয়ও দেখা দেবে। কর্ণাটকের ফলাফল আরও একটি বিষয় প্রমাণ করেছে। তা হলো— রাহুল গান্ধী যতই নিজেকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসাবে তুলে ধরুন না কেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতারই কিন্তু রাহুলের উপর ভরসা নেই। কর্ণাটকের এ মাথা থেকে ও মাথা চষে বেড়িয়ে রাহুল এবার প্রচার করেছেন, রাহুলের বাজনদাররাও তাঁকে ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরতে চেষ্টার কসুর করেননি। তবু, ফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, রাহুলের ক্যারিশমা কোনও কাজই দেয়নি কর্ণাটকে। তার চেয়েও বড় কথা, রাহুলের মতো এমন একজন ব্যর্থ এবং অসফল নেতাকে বিজেপি বিরোধী নেতৃত্বের জোটেও মেনে নেবেন না কেউ। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলিরই পায়ে পড়তে হবে রাহুল এবং কংগ্রেসকে। প্রশ্ন হলো, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির পায়ে পড়তে কি রাজি হবে কংগ্রেস?

কর্ণাটকের নির্বাচন আক্ষরিক অর্থেই বিজেপির সামনে দক্ষিণের দরজা খুলে দিয়েছে। কর্ণাটকের এই ফলাফল স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণ ভারতে বিজেপির প্রভাব এবং প্রসারের পক্ষে সহায়ক হবে। কর্ণাটকের এই নির্বাচনে যদি কংগ্রেস ভালো ফল করত, তাহলে বিরোধীরা অনেকটাই উল্লসিত হতো। বিজেপির পক্ষেও ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন অনেকটাই শক্ত হয়ে দাঁড়াত। তা না হওয়ায়, স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা কিছুটা হতোদ্যম হবেই। বিজেপিও লোকসভা নির্বাচনের আগে অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। বিজেপির আর যে একটি বড় লাভ হয়েছে, তাহলো, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প যে আর কেউ নেই— তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এটিও ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সুফল দেবে।

তবে, সবথেকে হাস্যকর কাণ্ডটি কংগ্রেস করেছে সরকার গঠন করার দাবি জানিয়ে। নির্বাচনের আগে দেবেগৌড়ার দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও জোট হয়নি। নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস সরকার গড়ার ধারেকাছেও ছিল না। কিন্তু ফলাফল রেরনোর পর বিজেপি যখন একক বৃহৎ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল, তখন বিজেপিকে সরকার গড়া থেকে দূরে রাখতে দেবেগৌড়ার পুত্র কুমারস্বামীর হাত ধরে কংগ্রেস নেতারা ছুটলেন সরকার গড়ার দাবি জানাতে। এক্ষেত্রে তাঁরা সাংবিধানিক নিয়মটুকুও ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করলেন না। নিয়মটি কী? নিয়মটি হলো— নির্বাচনের পূর্বেই গঠিত কোনও জোট যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তাহলে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য তাদেরই আগে ডাকবেন রাজ্যপাল। তা যদি না হয়, তাহলে বিধানসভায় সংখ্যার নিরিখে বৃহৎ দলকেই রাজ্যপাল মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য ডাকবেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য বলবেন। কর্ণাটকে কংগ্রেস- জেডিএসের মধ্যে নির্বাচনের আগে কোনও জোট হয়নি। সেক্ষেত্রে বিজেপিকে সরকার গড়তে ডেকে কোনও অন্যায় করেননি রাজ্যপাল। কিন্তু সরকার গড়ার প্রয়োজনীয় সংখ্যার ধারেকাছে না থেকেও কংগ্রেস যে উন্মত্তের মতো আচরণ করছে, তাতে এটাই প্রমাণ হয়েছে— এরা কতখানি ক্ষমতালোভী। আরও প্রমাণ হয়েছে— কোনও সাংবিধানিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা এরা করে না। যেন-তেন-প্রকারে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকাই কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের এই আচরণ ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে নিঃসন্দেহে তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে না।

গুজরাটের গোন্দালধামে কয়েকদিন

অমিত সাহা

আমি ভগবান স্বামীনারায়ণ মন্দির যা দেখেছি তা সবই গুজরাটের বাইরে। এ কথা বলা একেবারে ভুল হবে যে বাকি রাজ্যে ভগবান স্বামীনারায়ণের মন্দির নেই। বিশ্ববিখ্যাত হিন্দু আধ্যাত্মিক সংস্থা BAPS (বোচাসনবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থা)-র সৌজন্যে আজ ভগবান স্বামীনারায়ণের শিখরবত মন্দির সারা বিশ্ব জুড়ে। আমাদের কলকাতার কাছে জোকাতে আছে BAPS স্বামীনারায়ণের মন্দির। দর্শনার্থীরা সুযোগ পেলে দেখে আসতে পারেন বিশাল বড় ও ভব্য মন্দির। এর জন্য যিনি কৃতিত্বের অধিকারী তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় মহারাজ স্বামী আর ত'ার অনুরাগী হাজার হাজার সাধু এবং লক্ষ লক্ষ ভক্ত।

আমি মহারাষ্ট্রের নাসিকে থাকি। সুযোগ পেলেই সাধারণ বাঙালির মতো আমার ঘুরতে যাবার একটা বাতিক আছে। আমি এই বাতিক নিয়ে সারা জীবন বাঁচতে চাই। যাই হোক, পরপর তিনদিন ছুটি আর একটা CL নিয়ে প্ল্যানটা করেই নিলাম। নাসিক থেকে গুজরাত দুইভাবে যাওয়া যায়। এক মুম্বই হয়ে, তাতে প্রচুর বাস ও ট্রেন পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে সময় একটু বেশি লাগে। আর আছে নাসিক থেকে সরাসরি বাস, সেটা নাসিক থেকে সাপুতারা হয়ে ভালসাদ মানে দক্ষিণ গুজরাত। এর মধ্যে ভ্রমণপিপাসু বাঙালিদের জন্য বলে রাখা ভালো যে সাপুতারা হলো একটা হিল স্টেশন (শৈলশহর বলাটা ঠিক হবে না)। পাহাড়গুলো অত উচু না হলেও গিরিপথের মধ্যে দিয়ে যখন আমাদের বাস যাচ্ছিল তখন পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা খুব উপভোগ করছিলাম। মাঝে মাঝে চোখে পড়ার মতো স্ট্রবেরির খেত।

নাসিক থেকে প্রথমে গন্তব্য স্থান হলো রাজকোট জেলার গোন্দল ধাম। তার পরে বোটাড জেলার গাডরা ধাম। এখানে ভগবান স্বামীনারায়ণ স্বয়ং ত্রিশ বছর স্থূলদেহে ছিলেন। গাডরা থেকে যাই বোটাড জেলারই সাহারানপুরে। সাহারানপুর কষ্টভঞ্জন হনুমান মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। দেশ বিদেশ থেকে দর্শনার্থী আসেন এই স্থানে। সেই সঙ্গে রয়েছে সাহারানপুরে BAPS-এর সাধুদের ট্রেনিং সেন্টার। সাহারানপুর থেকে আমার শেষ গন্তব্য আমেদাবাদ। তিনদিনে প্রায় ১৫০০ কিমি. পথ চলতে হয়েছে যার পুরোটাই বাসে।

ধাম গোন্দল

ভগবান স্বামীনারায়ণের পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিলেন গুণাতীতানন্দ স্বামী, যাঁকে 'অক্ষর ব্রহ্ম' বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই ফাঁকে জানিয়ে রাখি যে, ভগবান স্বামীনারায়ণ স্থূলদেহে থাকার সময় তাঁর ভক্তদের নিজের তৈরি করা মন্দিরের আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিয়ে যান। তার মধ্যে ভাদতাল (লক্ষ্মীনারায়ণ দেব গদি) আর আমেদাবাদ (নরনারায়ণ দেব গদি) অন্যতম। BAPS-এর স্থাপনা করেন যোগী মহারাজ ১৯০৫ সালে। যাক সে কথা, আদার ব্যাপারি জাহাজের খবরে কাজ কী। আমার গোন্দাল ধাম আসার উদ্দেশ্য 'অক্ষর ডেরি'র ১৫০ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা আর এই সুযোগে ধাম দর্শন আর সাধু দর্শন সেরে নেওয়া।

'অক্ষর ডেরি' হলো BAPS স্বামীনারায়ণ ভক্তদের কাছে একটি পবিত্র স্থান। গুণাতীতানন্দ স্বামী ১৮৬৭ সালের ১২ অক্টোবর এই পৃথিবী থেকে অক্ষরধামে গমন করেন। যেই স্থানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বর্তমানে সেই স্থানটি হল 'অক্ষর ডেরি'। পরে তাঁর দেহাবশেষ পার্শ্ববর্তী গোন্দালি নদীতে বিসর্জন করা হয়। কিছুদিন পরে গোন্দালের রানিমা সেই স্থানে গুণাতীতানন্দ স্বামীর স্মরণে একটি ছোট মন্দির স্থাপন

করেন, যা হলো আজকের 'অক্ষর ডেরি'। মন্দিরটি আকার দেয়া হয় গোন্দালের 'নওলাখা' রাজমহলের এক ঝুলন্ত ব্যালকনির আদলে। এর কিছুদিন পরে স্বামী বালমুকুন্দ ওই স্থানে ভগবান স্বামীনারায়ণের কালো পাথরের পদযুগল স্থাপন করেন। স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের ভক্তদের কাছে এই মন্দিরটির মাহাত্ম্য অসীম। ভক্তরা 'অক্ষর ডেরি'কে ঘিরে প্রদক্ষিণ, ধুন, প্রার্থনা করে থাকেন। এমনই মনে করা হয় যে এই গোন্দাল মন্দিরে ভক্তদের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এমনকী এমনও হয়েছে ব্রহ্মস্বরূপ যোগী মহারাজকে শিখরবৎ মন্দির তৈরির সময় বিষধর কেউটে সাপে দংশন করলে তিনি অচৈতন্য হয়ে যান। তখনকার দিনে আধুনিক চিকিৎসার এত সুযোগ ছিল না। ব্রহ্মস্বরূপ শাস্ত্রীজী মহারাজ যিনি হলেন যোগী মহারাজের গুরু। তিনি ভক্তদের নির্দেশ দেন যে তাঁকে 'অক্ষর ডেরি'তে শুইয়ে দিতে এবং অনবরত স্বামীনারায়ণ ধুন করতে। প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে তাঁর দেহ থেকে সাপের বিষ নেমে যায়। এই ঘটনাকে দৈব ছাড়া কী বলা যায়! এ ছাড়া এমন অনেক ঘটনা আছে যা গোন্দাল 'অক্ষর ডেরি'কে একটি পুর্ণাঙ্গ ধামের রূপ দেয়। সব মহিমার বিবরণ এই স্বল্প পরিসরে লেখার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে **youtube**-এ খুঁজলে নিশ্চই পাওয়া যাবে।

এবারে আসা যাক আজকের গোন্দালে অবস্থিত **BAPS** স্বামীনারায়ণের শিখরবৎ মন্দির নির্মাণের ইতিহাসে। কোনও এক সময় গুণাতীতানন্দ স্বামী সূক্ষ্মদেহে তাঁর এক ভক্ত নারায়ণী মহারাজকে স্বপ্নাদেশ করেন ওই স্থানে একটি ত্রিশিখরি মন্দির বানাবার জন্যে। তখন তিনি অন্য হরিভক্তদের সঙ্গে গোন্দাল যান এবং গোন্দালের রাজার থেকে ২৫,০০০ টাকার বিনিময়ে ও কিছু শর্তে মন্দির নির্মাণের জন্য জায়গা কিনে নেন। শর্ত ছিল যে মন্দির নির্মাণ করতে হবে ওই স্থানে অবস্থিত 'অক্ষর ডেরি'র উপরে এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে এবং মন্দির নির্মাণের জন্য কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। শর্ত শুনতে আর যাই মনে হোক, মনে করে দেখুন আজ থেকে ৮০-৮৫ বছর আগে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির বানানো খুব সহজ কথা নয়। গুণাতীতানন্দ স্বামী তাঁর 'স্বামিনো ভাতো' গ্রন্থে বলেছেন, ভগবানের দ্বারাই ভগবানকে চেনা যায়। শাস্ত্রীজী মহারাজ এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি কিনা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১৯০৫ সালে আজকের এই বোচাসনবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম সংস্থা অর্থাৎ **BAPS** স্বামীনারায়ণ সংস্থা তৈরি করেন। মহারাজের সেই সময় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুতীব্র কর্মময় জীবনের আলোচনা কোনও এক সময় করা যাবে। ব্রহ্মস্বরূপ শাস্ত্রীজী মহারাজের অক্ষর পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা ও সেই সঙ্গে মন্দির স্থাপন এই সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ। শাস্ত্রীজী মহারাজ তাঁর লৌকিক জীবনকালে মোট ৫টি শিখরবত মন্দির নির্মাণ করে যান। সেগুলো হলো বোচাসন (১৯০৭), সাহারানপুর, গোন্দাল, আটলাদর (বরোদা), গাদড়া (গাড়পুর)। গোন্দাল মন্দিরের কাজ শেষ হয় ১৯৩৪ সালে। মন্দিরে দর্শনার্থীরা দর্শন করতে পারেন ভগবান স্বামীনারায়ণ ও গুণাতীতানন্দ স্বামীর প্রায় এক মানুষ সমান অষ্টধাতুর যুগল মূর্তি ও সেইসঙ্গে ভগবানের আরও অন্য প্রতিমা। পরবর্তীকালে উনি এই মন্দিরের দেখাশোনার ভার দেন যোগীজী মহারাজের হাতে। এই মন্দির প্রাঙ্গণে যোগীজী মহারাজের ব্যবহৃত অনেক জিনিস, ওনার বাসস্থান দেখে নেওয়া যেতে পারে। শাস্ত্রীজী মহারাজ ৫টি মন্দির নির্মাণ করে যান, কিন্তু তাঁর শিষ্য শাস্ত্রী নারায়ণ স্বরূপ দাস যিনি কিনা পরবর্তীকালে আমাদের সকলের আপন প্রধান স্বামী মহারাজ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসী ও হরিভক্তদের জন্যে ১২০০ মন্দির ও অক্ষরধামের মতো সুবিশাল সৌধ স্থাপন করে যান।

এবারে একটু দেখে নেওয়া যাক, এখনকার গোন্দালের কর্মকাণ্ড। আগেই বলেছি যে, আমি গোন্দালে এসেছি 'অক্ষর ডেরি'র সার্ধ শতাব্দী মহোৎসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে। এই ভব্য দশদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয় এবারে বসন্ত পঞ্চমীর দিন (২০ জানুয়ারি, ২০১৮)। উপস্থিত ছিলেন বর্তমানে সংস্থার মুখ্য পরম পুজ্য মোহন্ত স্বামী মহারাজ, মুখ্য অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ। উপস্থিত ছিলেন কয়েকশো সাধু ও দেশবিদেশের হাজার হাজর হরিভক্ত এবং দর্শনার্থী। এই পুণ্য মহোৎসব উপলক্ষে গোন্দাল মন্দির প্রাঙ্গণে একটি একশিখরি গোলাপি পাথরের যোগীস্মৃতি মন্দিরের উদ্‌বোধন করেন মোহন্ত স্বামী মহারাজ। সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ বৈদিক রীতিতে ব্রহ্মস্বরূপ যোগী মহারাজের মূর্তি স্থাপন করেন।

গোন্দাল মন্দিরের ঠিক পিছনে গোন্দালি নদী। আর নদী পেরিয়ে আছে বিশাল এক প্রাঙ্গণ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান এই প্রাঙ্গণে হয়। বিশাল সভামণ্ডপ বা মঞ্চ স্থাপন করা হয় যার উপরে ছিল 'অক্ষর ডেরি'র আদলে তৈরি এক বিশাল প্রতিকৃতি। কারুকার্যে মঞ্চের পিছনে আকাশি রঙের দেওয়াল যার মধ্যে থেকে দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করছেন। সে দৃশ্য লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে এর থেকে সহজেই সাধু ও হরিভক্তদের মোহন্ত স্বামী মহারাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায়। মূল মঞ্চ ছাড়াও প্রাঙ্গণের একদিকে ছিল একটা বিশাল প্রবেশদ্বার ও তার সামনে প্রমুখ স্বামী মহারাজের একটি বিশাল আকারের মূর্তি। সেই সঙ্গে অন্য দেবতার মূর্তি। প্রাঙ্গণের চারিপাশে ছিল ৬টি সভাগৃহ যেখানে একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চলছিল অডিয়ো-ভিডিয়ো শো। ছুটির দিন ও বিকালের দিকে প্রতিটি সভাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ। কোথাও আবার বিশাল লম্বা লাইন। সময়ের অভাবে সব শো আমার দেখা হয়নি। তবে যে কটা দেখেছি তাতে রয়েছে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার বার্তা আর অত্যাধুনিক পরিবেশন। সব শেষে ছিল আলো ও শব্দের (**Light & Sound**) শো আর সঙ্গে লেজার (**Lezar**) শো পাওনা। প্রায় ২৫ মিনিটের এই শো আপনার মন জয় করে নিতে বাধ্য। এইসব ছাড়াও সভাপ্রাঙ্গণে ছিল অনবরত নামের ব্যবস্থা। প্রাঙ্গণের একদিকে ছিল ভক্তদের জন্যে প্রসাদের ব্যবস্থা। যারা অনেক দূর থেকে এসেছিলেন তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে অতিথিশালায় বা আশেপাশের কোনও ভক্তের বাড়িতে। যেমন আমি ছিলাম মুম্বই থেকে আসা কিছু ভক্তের সঙ্গে। এই অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে মোহন্ত স্বামী মহারাজ যেহেতু উপস্থিত ছিলেন, তাই হরিভক্তদের কাছে উপরি পাওনা তাঁর সকালের পূজা দর্শন যা স্বামীনারায়ণের ভক্তদের কাছে অমূল্য মুহূর্ত। প্রতিদিন হরিভক্তরা সকাল ৫.৩০ মি: স্নান ও পূজা সেরে সভাগৃহে উপস্থিত হতেন।

আমি যেহেতু কম সময়ের জন্য ছিলাম এই অনুষ্ঠানে, তাই হয়তো আমার এই প্রয়াস মহোৎসবের সঠিক ব্যাপ্তি পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে অক্ষম। তবুও যতটা পেরেছি বাঙালি পাঠকদের জানানোর চেষ্টা করলাম। যদি কিছু মনের মধ্যে রাখার থাকে তা হল 'অক্ষর ডেরি'র স্মৃতি। যে সকল বাঙালি পর্যটক রাজকোট থেকে দ্বারকার দিকে যান, তাঁরা রাজকোট থেকে মাত্র ৪৫ মিনিট দূরে গোন্দাল ধাম দেখতে ভুলবেন না। ■

এই সময়

আর্চবিশপের আবেদন

গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের সময় গান্ধীনগরের আর্চবিশপ টমাস ম্যাকওয়ান জাতীয়তাবাদী শক্তিকে পরাজিত করার জন্য খ্রিস্টানদের আবেদন জানিয়েছিলেন। দিল্লির আর্চবিশপ অনিল জেটি কুটোও সম্প্রতি একই কাজ করেছেন। তার লক্ষ্য ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন।

রাষ্ট্রদূতের বিশ্বাসভঙ্গ

ইসলামাবাদে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মাধুরী গুপ্তাকে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দিল্লি হাইকোর্ট দোষী

সাব্যস্ত করেছে। অভিযোগ, তিনি নানান গুরুত্বপূর্ণ নথি পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর হাতে তুলে দিয়েছেন। শীঘ্রই তার শাস্তি ঘোষণা করে রায় দেবে আদালত।

জোজিলা

জম্মু ও কাশ্মীরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

জোজিলা টানেলের শিলান্যাস করেছেন। পরিকল্পিত টানেলটির দৈর্ঘ্য ১৪ কিমি.। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী তিব্বতি ধর্মগুরু কুশক বাকুলা রিনপোচের ১৯তম জন্মবার্ষিকী সমারোহে অংশ নেন।

সমাবেশ -সমাচার

নাগপুরে সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের শুভারম্ভ

'সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর স্বয়ংসেবকদের আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার হেডগেওয়ার ও পরমপূজনীয় শ্রীগুরজীর পবিত্র তপোভূমিতে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করার। তৃতীয়বর্ষ প্রশিক্ষণ কোনও ডিগ্রি বা শংসা পত্র পাওয়ার জন্য নয়। এটি স্বয়ংসেবক নির্মাণ প্রক্রিয়ার একটি পর্যায় মাত্র।' গত

১৪ মে মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরের রেশিমবাগে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মৃতিভবনের মহর্ষি ব্যাস সভাগৃহে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের জন্য সারা দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের সামনে কথাগুলি বলেন সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে।

এবার তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে সারাদেশ থেকে চয়নিত ৭০৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ থেকে ২৪ এবং উত্তরবঙ্গ থেকে ১২ জন অংশগ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১০০ জন দক্ষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ দানের জন্য রয়েছেন।

২৫ দিনের এই প্রশিক্ষণ বর্গে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহ-সরকার্যবাহ বি ভাগাইয়া। বর্গে সর্বাধিকারীরূপে উত্তরাখণ্ড প্রান্ত সঙ্ঘচালক সরদার গজেন্দ্র সিংহ, বর্গ কার্যবাহ রূপে যোধপুর প্রান্তের কার্যবাহ শ্যাম মনোহর, মুখ্যশিক্ষক হিসেবে অবধ প্রান্তের সহ-শারীরিক প্রমুখ, সহ-মুখ্য শিক্ষক মহকোশল প্রান্তের সহ-শারীরিক প্রমুখ, বৌদ্ধিক প্রমুখ হিসেবে দিল্লি প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখ উত্তম প্রকাশজী, সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ হিসেবে উত্তর কর্ণাটক প্রান্তের বৌদ্ধিক প্রমুখ কৃষ্ণাজী যোশী, ব্যবস্থা প্রমুখ হিসেবে নাগপুরের ধর্ম জাগরণ সংযোজক সুনীল মূলগাঁওকরজী এবং পালক অধিকারী রূপে রয়েছেন

বেলডাঙ্গায় শিক্ষার্থীদের একাংশ।

এই সময়

বঙ্গে পদ্ম

তৃণমূলের গুণ্ডারা চেষ্টার কসুর করেনি। তবুও পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গায় পদ্মের পাপড়ি

মেলা থামানো যায়নি। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় পদ্ম ফুটেছে।

ইংরেজিতে আয়ুষ

খবরটা যে ভালো কোনও সন্দেহ নেই। 'আয়ুষ' শব্দটি ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায়

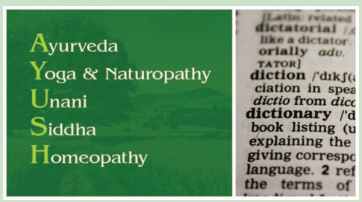

প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক অভিধানে স্থান পেয়েছে। কমিশন ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল টার্মিনোলজির পক্ষ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, আয়ুষ শব্দটিতে পাঁচটি বিশেষ চিকিৎসাপদ্ধতি স্থান পেয়েছে।

ঝুলন ছবি

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামীর জীবন নিয়ে

সিনেমা তৈরি হবে। ছবিটি প্রযোজনা করবে সোনি পিকচার্স। উল্লেখ্য, ঝুলন নদীয়া জেলার চাকদহের মেয়ে। দীর্ঘদিন তিনি বল হাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

সহ-সরকার্যবাহ মুকুন্দজী।

দক্ষিণবঙ্গের ছাত্রদের সাধারণ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির এবং চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীদের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় শুরু হয়েছে। তাঁতিবেড়িয়ায় ২০৬ জন এবং বেলডাঙ্গায় ২৩৫ জন অংশগ্রহণ করেছেন।

উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরে উত্তরবঙ্গের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে ২০০ জন এবং পূর্বক্ষেত্রের সাধারণ দ্বিতীয় বর্ষে উত্তরবঙ্গের ৫৭ জন, দক্ষিণবঙ্গের ৯৩ জন, ওড়িশা পূর্ব ৫৬ জন, ওড়িশা পশ্চিম ২৬ জন-সহ মোট ২৩২ জন অংশগ্রহণ করেছে। অসমের হোজাইয়ে বিশেষ দ্বিতীয় বর্ষে দক্ষিণবঙ্গের ১২২ ও উত্তরবঙ্গের ২৮ জন অংশগ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, এবছর সারা দেশে ৯২টি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলছে।

কলকাতার বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভায় গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ২৫ বৈশাখ ১৪২৫ (৯ মে ২০১৮) বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার কৃপাশরণ হলে প্রকাশিত হয় তাপস অধিকারীর গ্রন্থ 'মহাপ্রাণের ভুবনে'। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, এমেরিটাস অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ড. দীপক ঘোষ, ভারতীয়

সংগ্রহশালা এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী, শিক্ষাবিদ ড. মীরাতুন নাহার, সম্পাদক এমদাদুল হক নূর, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক নেত্রেন্দু বিকাশ চৌধুরী প্রমুখ। বইটির প্রকাশক তথাগত। প্রত্যেককেই তাঁদের বক্তব্যে লেখকের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শৈলীর প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থে প্রত্যেক প্রাণী—পাখি, কীটপতঙ্গকে মহাপ্রাণ রূপে বর্ণনা করেছেন লেখক।

কলকাতার শঙ্খনাদের নারদ জয়ন্তী ও সাহিত্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

গত ১৪ মে সন্ধ্যায় কলকাতা মানিকতলার রামমোহন লাইব্রেরি হলে দক্ষিণবঙ্গের জাগরণ পত্রিকা শঙ্খনাদের উদ্যোগে দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী এবং শঙ্খনাদ সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০১৮-র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট লেখক ও সমাজসেবী ড. জিষ্ণু বসু। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কলকাতা প্রেসক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সুজিত রায়। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত

এই সময়

কাবেরী

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট কাবেরী নদীর জল বণ্টন সংক্রান্ত কেন্দ্রের তৈরি খসড়া অনুমোদন করেছে। উল্লেখ্য, এই খসড়া নিয়ে আগেই

আপত্তি জানিয়েছিল কর্ণাটক ও কেরল সরকার। আদালত সেই আপত্তি খারিজ করে দিয়েছে। সংবিধান তৈরিতে বিলম্ব সংক্রান্ত তামিলনাড়ুর অভিযোগও নাকচ করেছে আদালত।

পঞ্জাব

পঞ্জাবে এক শ্রেণীর ট্র্যাভেল এজেন্ট বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। ড্রাগপাচার থেকে শুরু করে নারী পাচার— সব কিছুই এদের

অপরাধের তালিকায় আছে। পঞ্জাব সরকার এদের নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত।

স্বচ্ছ শহর

ইন্দোর আর ভোপাল তাদের শিরোপা ধরে রাখল। এবারও তারা ভারতের স্বচ্ছ শহরের

তকমা পেয়েছে। দেশের তৃতীয় স্বচ্ছ শহরের সম্মান পেয়েছে চণ্ডীগড়। কলকাতা কোনও স্থানই পায়নি। কেন্দ্রের নগরবিকাশ মন্ত্রক এই খবর দিয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক শান্তনু সান্যাল। সাংবাদিক সুজিত রায় সাহিত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বহু সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 'রামকথা' অনুষ্ঠান

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে কলকাতার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে গত ১৯ মে 'রাম কথা' অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়েছে। কল্যাণ আশ্রমের

উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল গোসাবায় নির্ণীয়মাণ ছাত্রী নিবাস এবং কল্যাণ আশ্রম পরিচালিত সেবাকাজের বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'রাম কথা'র আয়োজন করা হয়েছে। সনাতন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রখ্যাত কথাকার বিদুষী বিজয়া উর্মিলিয়া প্রতিদিন দুপুর ২ টা থেকে সন্ধ্যায় ৬টায় প্রবচন রাখছেন।

জামানত বাজেয়াপ্ত

ভেবেছিলেন সহানুভূতি সম্বল করে নির্বাচনী বৈতরণী পেরিয়ে যাবেন। তা তো হলোই না, উপরন্তু জামানত বাজেয়াপ্ত হলো। তাই সিঙ্গুরের মনোরঞ্জন মালিক বেশ মুষড়ে পড়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মনোরঞ্জন মালিক হলেন তাপসী মালিকের বাবা। তিনি জেলা পরিষদের নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রতীক ছিল মোটর গাড়ি। ভোট পেয়েছেন ১২৩৭টি। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবার আগে যেসব ঘটনা মানুষের অন্তরকে নাড়িয়ে দিয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম তাপসী মালিকের হত্যাকাণ্ড। বস্তুত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সিঙ্গুর জমি আন্দোলন জমে উঠেছিল। নির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মমতা।

পৌরাণিক নগর : কম্বোজ (রাজপুর)

গোপাল চক্রবর্তী

পৌরাণিক নগর এবং জাতি-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে 'কম্বোজ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদে এদের উল্লেখ না থাকলেও বংশ ব্রাহ্মণের শিক্ষক তালিকায় কম্বোজ দেশীয় উপাধ্যায় উপমন্যের উল্লেখ আছে। রামায়ণের আদিকাণ্ডে বলা হয়েছে, বশিষ্ঠের অনুরোধে স্বর্গীয় গাভী সবলা কম্বোজদের সৃষ্টি করেন। পারস্য লেখমালায় এরা কম্বুজিয় নামে পরিচিত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এবং অশোকের পঞ্চম শিলানুশাসনে কম্বোজদের উল্লেখ আছে।

বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজরা জেলা নিয়ে রাজপুর বা বর্তমান রাজওরি ছিল কম্বোজদের বাসভূমি। মহাভারতে বর্ণিত আছে কর্ণ রাজপুরে গিয়ে কম্বোজদের পরাজিত করেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনাতেও কাশ্মীরের দক্ষিণে রাজপুর নামে এক রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। নন্দীপুর ছিল এদের প্রধান নগর। সম্ভবত এই জনপদ ছিল গান্ধারের খুব কাছে। প্রাচীন গ্রন্থ এবং লেখ মালা সমূহে এই দুটি জনপদ একত্রে উল্লিখিত। কম্বোজের পশ্চিম সীমা কাফ্রিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পালি সাহিত্যে একে ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্ভুক্ত একটি জনপদ বলা হয়েছে।

যাস্ক ভাষাতত্ত্বের বিচারে কম্বোজদের সঙ্গে কম্বলের সাদৃশ্য নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, কম্বোজদের এহেন নামের কারণ তারা 'কমনীয়ভোজ' অথবা কমনীয় উপকরণের ভোক্তারূপে পরিচিত ছিল। মহাভারতে কম্বোজরা উত্তম কম্বল প্রস্তুতকারক রূপে উল্লিখিত। সভাপর্বের তৃতীয় সর্গে বলা হয়েছে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও কম্বোজরাজ প্রচুর মূল্যবান চর্ম, স্বর্ণখচিত পশমি কম্বল, বিবরবাসী লোমশ পশু এবং মার্জারের লোমদ্বারা তৈরি কম্বল উপহার দেন। কম্বল ছাড়াও প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সর্বত্র কম্বোজের অশ্বের খ্যাতি ছিল। প্রাচীন 'সুমঙ্গলাবিলাসি' কাব্যে কম্বোজকে অশ্বের আবাস ভূমিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্বে বর্ণিত আছে, কম্বোজরাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনশত বিচিত্রবর্ণের অশ্ব উপহার দেন। এদের দেহ ছিল তিতির পাখির মতো চিত্রিত, আর নাক ছিল শুকপাখির মতো।

হরিবংশে এবং মহাভারতে কম্বোজরা ক্ষত্রিয় জাতিরূপে উল্লিখিত। এক সময়ে কম্বোজ বৈদিক ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কম্বোজদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দুর্যোধনের মিত্ররূপে যোগ দেন। দ্রুপদের পরামর্শে যুধিষ্ঠির কম্বোজদের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। ভীষ্ম তাঁর বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে সুদক্ষিণ নিহত হন। তাঁর ভ্রাতারও এই যুদ্ধে মৃত্যু হয়। যুদ্ধে প্রচুর শক্তিক্ষয়ের ফলে কম্বোজরা দুর্বল হয়ে পড়ে। মহাভারতের শান্তি এবং অনুশাসন পর্বে বর্ণিত আছে, এক শ্রেণীর বর্বর যাযাবর জাতি এরপর কম্বোজের ক্ষত্রিয়দের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। ভূরিদত্ত জাতকে এখানকার রীতিনীতি অনার্য প্রকৃতির বলা হয়েছে। হিউয়েন সাঙ রাজপুর এবং তার পশ্চিমে অবস্থিত লোকদের অসভ্য বলে বর্ণনা করেছেন। মনে হয়, এই বর্বর জাতির সংস্পর্শে কম্বোজ সংস্কৃতির

অবনতি ঘটে। পরবর্তী যুগে অন্য রাজবংশ গঙ্গাযমুনা- অধ্যুষিত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করলে কম্বোজের গুরুত্ব কমে যায়। যাস্কের সময় দেখা যায় যে ভারতের মূল অধিবাসীদের থেকে কম্বোজগণ একটি পৃথক গোষ্ঠী ছিল এবং ভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলত। সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে কম্বোজ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকলে সম্ভবত সনাতন রীতিনীতি ভুলে বর্বর হয়ে গিয়েছিল।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র বিনষ্ট হওয়ায় এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করায় শক, যবন এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় জাতির মতো কম্বোজরা ক্রমশ শূদ্র জাতিতে পরিণত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কম্বোজদের বার্তাশস্ত্রোপজীবী সঙ্ঘ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, যুদ্ধব্যবসায় প্রভৃতি ছিল এদের জীবনধারণের উপায়। এদের মধ্যে মস্তক মুণ্ডনের একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। ভূরিদত্ত জাতক থেকে আমরা জানতে পারি, অনার্য কম্বোজরা বলত, পোকামাকড়, মাছি, সাপ, মৌমাছি, ব্যাং ইত্যাদি হত্যা করে মানুষ পবিত্র হতে পারে। যাস্কের নিরুক্ত এবং হিউয়েন সাঙের রাজপুরার বিবরণে এর সমর্থন পাওয়া যায়। খ্রিঃ পুঃ চতুর্থ শতকে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সময় এই অঞ্চলে গণতন্ত্র গড়ে উঠে।

খ্রিস্টীয় নবম শতকে পালরাজ দেবপাল কম্বোজদের পরাজিত করেন। কিন্তু পালরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তারা বাংলার রাজনীতিতে ফিরে আসে। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে কম্বোজ বংশীয় গৌড়ের একজন পতির কথা জানা যায়। সম্ভবত দেবপালের সময় এরা গৌড় অধিকারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, এবং দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে পুনরায় উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করে। বর্তমান উত্তরবঙ্গের কিছু অধিবাসী এদের বংশধর। নবম পালরাজ প্রথম মহীপাল ৯৭৮ অথবা ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে কম্বোজদের বিতাড়িত করে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। ■

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের পূর্ণতা প্রাপ্তি ও বিশ্বরূপ প্রদর্শনের শততম বর্ষপূর্তি

শ্রী অজয় ঘোষ

১৩২৪ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব চুঁচুড়ায় ভূদেব চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত পড়তে যান। গঙ্গার উপরে ভূদেববাবুর বাড়ির দোতলায় একটি ঘরে তিনি আরও দুজন সহপাঠীর সঙ্গে থাকতেন। ওই বছর ২৩ পৌষ, সময় রাত্রি ১২টা। (ইংরোজি ৭ জানুয়ারি, ১৯১৮ সাল, সোমবার)। তাঁর সঙ্গীদ্বয় নিদ্রিত। তিনি বদ্ধপদ্মাসনে আসীন। কিছুক্ষণ পর আসন ত্যাগ করে চোখ বুজে হৃদয়ে ধ্যানরত। তৎকালে এক হাতে ত্রিশূল অপর হাতে ডমরু নিয়ে আবির্ভূত হলেন শিব। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্ন করলেন—'আপনি কে?' শিব উত্তর দিলেন— 'আমি তোর গুরু। বাল্যে এসেছিলাম, চিনতে পারিসনি, আবার এসেছি।' শ্রীশ্রীঠাকুর—'আপনি যদি গুরু হন তো ইষ্ট দর্শন করান।' শিব পঞ্চমুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাকেন। তখন শিবের স্কন্ধ হতে একটি স্ত্রীমূর্তি নামলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর—'আপনি কে?' উত্তর এল—'আমি তোর মা।' তারপর দেবী সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে কানে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। শিব পঞ্চমুখে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন, নেচে নেচে ডমরু বাজিয়ে। ক্রমে মন্ত্র গেল, রাম রাম গেল, ওম্ ওম্ গেল। সাপের গর্জনের ন্যায় ভেতর থেকে ধ্বনি উঠতে লাগল। চক্ষু খুলে ভ্রূমধ্যে ত্রাটকে গেল। স্বতঃই ত্রাটক হয়ে গেল। গোলাকার জ্যোতির আবির্ভাব। রাত্রি ৪টার সময় কারখানার সাইরেনের শব্দে চেতনা এল।

ওই বছরই সরস্বতী পূজার দিন (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮) সকালে দিগসুইয়ে গুরুগৃহে জপ করবার সময় একটি সাধুমূর্তি নেমে এলেন। সাধুটি বিশ্ববন্দিত কালীসাধক ছিলেন। প্রশ্ন উঠল, ইনি কে? বুঝলেন এটি তাঁর জন্মান্তরীণ দেহ। চোখ জলে ভরে এল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—'মা এ জন্মেও মুক্তি দিসনি।'

দোলপূর্ণিমার পর প্রতিপদে শ্রীব্রজনাথের দোল, তাই দোলের আগের দিন ডুমুরদহে আসেন। দোলপূর্ণিমার দিন (২৭ মার্চ, ১৯১৮) তাঁর 'পূর্ণতা' প্রাপ্তি ঘটলো ডুমুরদহে। অফুরন্ত শক্তি আর অফুরন্ত আনন্দে মেতে উঠল মন। প্রতিপদে শ্রীব্রজনাথের দোল মিটিয়ে গেলেন দিগসুই।

গুরুদেব প্রশ্ন করলেন—'কিম্।' তিনি উত্তর দিলেন—'আসুন।'

গুরু, গুরুপত্নী, সহধর্মিণী তিনি একত্রিত হলেন গোয়ালঘরে। দ্বারে প্রহরী রইল। ২-৩ মিনিটের মধ্যে সকলের শরীর নখাগ্র হতে কেশাগ্র পর্যন্ত কাঁপতে লাগল। সম্মুখে রাধাকৃষ্ণ মূর্তির আবির্ভাব—বহু আকাঙ্ক্ষিত ইষ্টদর্শন। সেই অলৌকিক দর্শনের পর গুরুদেব তিন-চার দিন বাহ্যজ্ঞানরহিত ছিলেন।

দিন কয়েক পর গুরুদেব বলেন—বিশ্বরূপ দেখাও। শ্রীশ্রীঠাকুর লিখছেন—'পরে বিশ্বরূপ দেখাও বলেন। তাঁকে নিয়ে বসি দুজনে। তাঁর হাত ধরি...।' গুরু দেখলেন, তৃপ্ত হলেন। তারপর বললেন—তুমি মিথ্যাবাদী। মন্ত্রগ্রহণকালে সত্য ছিল—'আবয়োস্তুল্যফলদো ভবতু।' এই মন্ত্র উভয়ের তুল্য ফলদায়ী হউক।

এই রহস্য সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, 'যতদিন সীতারাম প্রকট আছে ততদিন বলা হবে না।' তাই আজ এ রহস্য প্রকাশ করা হলো। পঞ্চ সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। কিন্তু কলিযুগে কোনও সাধু বা মহাপুরুষ এভাবে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন এ আমাদের অজানা।

এই ঘটনার পর গুরুদেব (শ্রীমদ্ দাশরথিদেব যোগেশ্বর) পুত্রের হাত দিয়ে দুটি শ্লোক রচনা করে পাঠালেন শিষ্যকে..., যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল বললেই চলে—

'গুরুর্বা শিষ্যেবা ভবসি কতরো ন বিদিতং
অহন্তে ত্বং মেবৈ প্রকৃতিসুলভাৎ তৎ সুবিদিতং।
গুরুশ্চেৎ শিষ্যোহহং শরণমুগতং পাহি (শাধি) কৃপয়া
শিষ্যশ্চেৎ কিমসি গঠিতস্তৎ কথয় মে।।'

তুমি আমার কে—গুরু, না শিষ্য তাহা জানি না? তবে স্বভাবতঃ এইটি বেশ জানি আমি তোমার, তুমি আমার। যদি গুরু হও, তবে আমি তোমার শিষ্য, শরণ লইতেছি কৃপা করিয়া উদ্ধার কর (শিক্ষা দাও)। আর আমি যদি তোমার গুরু হই, তবে বল তুমি কে, তোমার স্বরূপ কী এবং কী উপাদানে গঠিত?

এই দুর্লভ সংঘটনগুলির শতবর্ষ অতিক্রান্ত হতে চলেছে। সেই উপলক্ষ্যে দিগসুই ধামে পরমগুরুবাড়িতে পঞ্চম দোলের দিন (ইংরাজি ৬ মার্চ, '১৮) যে গোয়ালঘরে (বর্তমান রন্ধনগৃহে) পরম ঈপ্সিত দর্শন হয়েছিল, সেই পুণ্য স্থানে একটি মনোরম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে।■

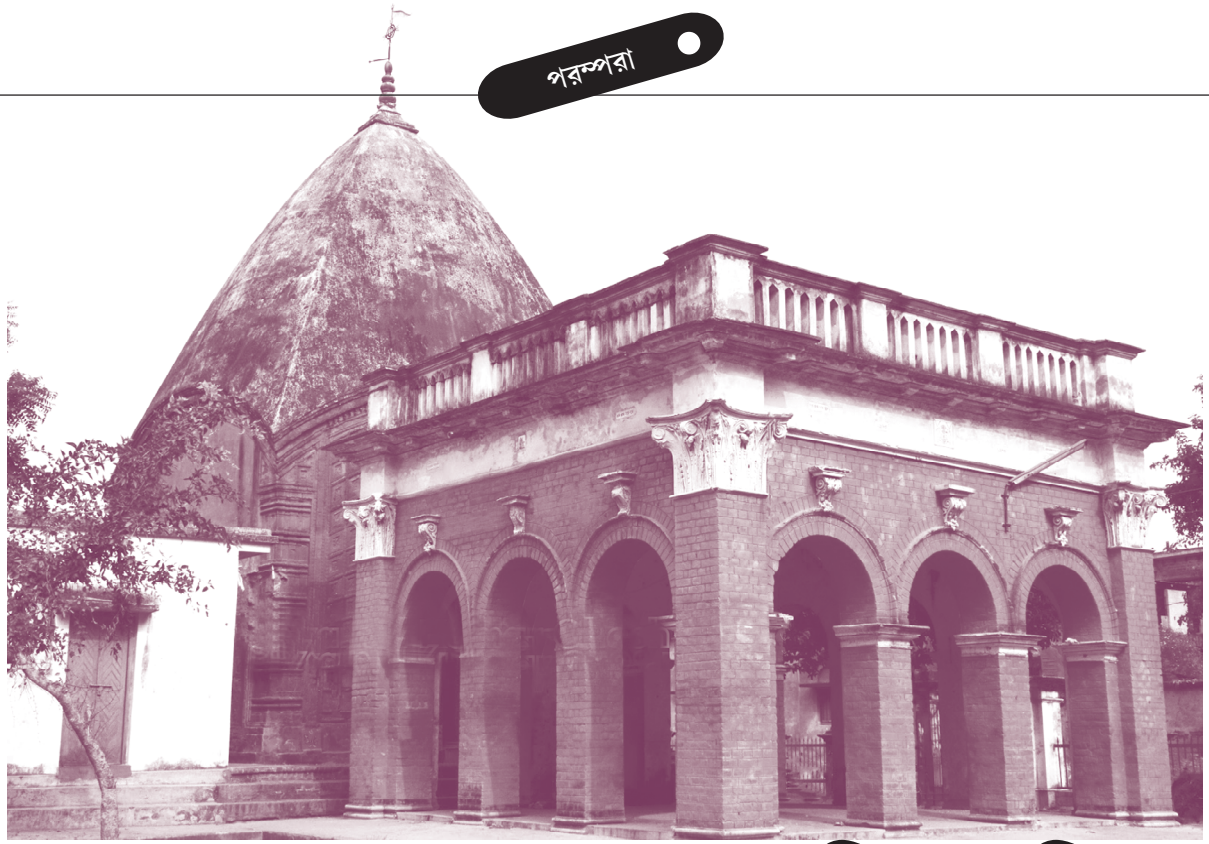

কমলাক্ষ ও জলেশ্বর শিবমন্দির

জলজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিন প্রভু হলেন শ্রীচৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য। এনাদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্যের সাধনপীঠ ছিল নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কাছে গঙ্গতীরে বাবলা গ্রামে। এখনও অনতিদূরে গঙ্গার পুরনো খাত চোখে পড়ে। বাবলায় এখনও অদ্বৈতাচার্যের শ্রীপাট অবস্থিত। এই শ্রীপাটের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী সম্প্রদায়ের সীতানাথ দাস।

অদ্বৈতাচার্যের প্রকৃত নাম কমলাক্ষ। বৈষ্ণবদের কাছে তিনি মহাবিষ্ণুর অবতার। বেদ-উপনিষদ-গীতা ইত্যাদি শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে তিনি বেদপঞ্চানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। শোনা যায়, তাঁরই কাতর প্রার্থনায় নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব। এহেন অদ্বৈতাচার্যের তিরোভাবের পর তাঁর কাঠের দুটি পাদুকা ও কমণ্ডলু হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধর প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সদলবলে হরিসংকীর্তন করতে করতে শ্রীপাট এলে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কোথা হতে একটা কুকুর হঠাৎ বিজয়কৃষ্ণের সামনে এসে হাজির হয়। লেজ নাড়তে নাড়তে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করে। যেতে যেতে মাঝে মাঝে পিছনে ফিরে তাকায়। এটা কোনও ইঙ্গিত বা সংকেত বিবেচনা করে বিজয়কৃষ্ণও সদলবলে তার পিছু পিছু হাঁটা দেন। খানিকটা পথ চলার পর গাছপালা ঘেরা জায়গায় এসে গড়াগড়ি দেয় এবং মুখ ঘষতে থাকে। সেই দৃশ্য দেখে বিজয়কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের সেখানে মাটি খুঁড়তে বলেন। মাটি খুঁড়তেই পাওয়া যায় অদ্বৈতাচার্যের 'কমলাক্ষ' নামাঙ্কিত পাদুকা ও কমণ্ডলু। সেগুলি তৎক্ষণাৎ শ্রীপাটে সংরক্ষিত করা হয়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন শান্তিপুরে থাকতেন, তখন একবার ওই অঞ্চলে নিদারুণ খরা হয়। খরায় স্থানীয় মানুষ যত্রতত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন শান্তিপুরের অধিবাসীরা বিজয়কৃষ্ণের কাছে এমন অনাবৃষ্টির থেকে পরিত্রাণের জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়।

শান্তিপুরের মতিগঞ্জ-বেজপাড়ায় জলেশ্বর নামে এক বিখ্যাত চারচালা শিবমন্দির রয়েছে। নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের এক রানি ১৮ শতকে শিবলিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (মতান্তরে প্রতিষ্ঠাতা নদীয়ারাজ রাঘব রায়)। তখন তিনফুট কালো পাথরের শিবলিঙ্গের নাম ছিল রুদ্রকান্ত ও রাঘবেশ্বর। অনাবৃষ্টির প্রকোপ থেকে জনসাধারণকে বাঁচাতে বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যদের সঙ্গে শিবলিঙ্গের মাথায় ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল ঢালতে লাগলেন। শিবের মাথায় গঙ্গাজল পড়তেই আচমকা তুমুল বৃষ্টি নামল। জনসাধারণ ধন্য ধন্য করতে লাগল। তখন থেকে শিবলিঙ্গের প্রাচীন বদলে নতুন নাম হলো জলেশ্বর। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

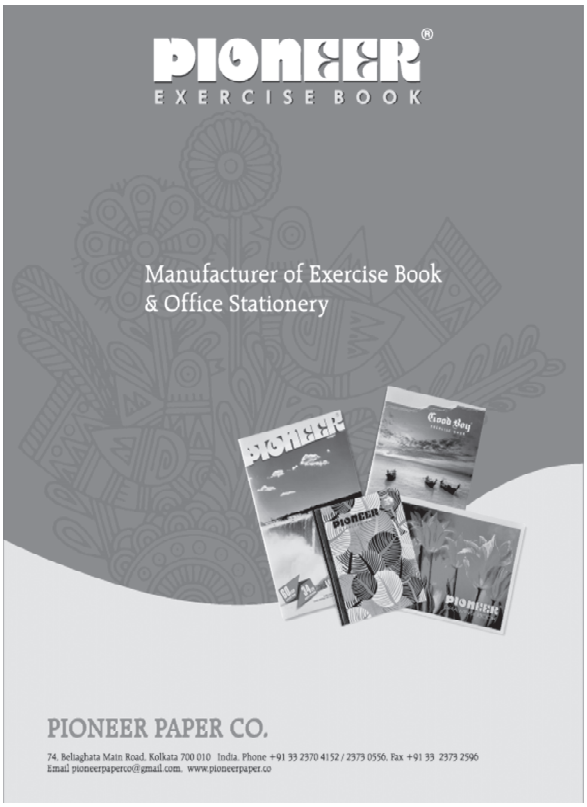

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

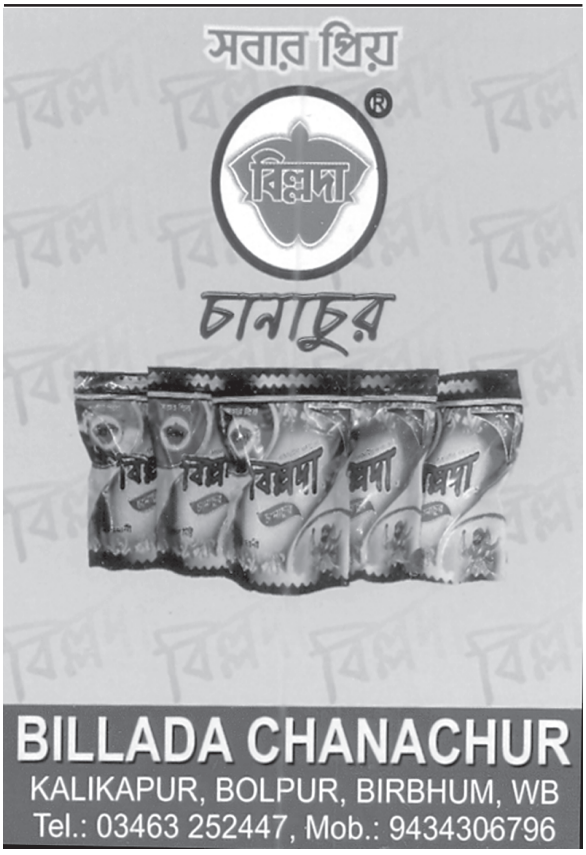

স্নেহের ভিখারি

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলে দিয়েছে, পুরুষরা সবসময়ে স্ত্রী-র কথা শুনে চলবে। খবর রাখো?

—যে পুরুষের বউ জোটেনি সে কী করবে?

—আর যে স্ত্রী কখনও কোনও কথাই বলে না, কী হবে তার স্বামীর?

তৃতীয় ব্যক্তিটির কথা, মল্লিকাদির মুখে শুনেই অনিমেষ চকিতে নিজের বউকে লক্ষ্য করল। পুরুষরা কেউ সেটা খেয়াল করল কি না বোঝা গেল না। কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধতার পর পার্থ একটু তেতো হেসে বলল, আহা, হবে আবার কী? পরস্ত্রীদের কথা শুনে চলতে হবে। প্রমোদ ভ্রমণে যেতে হবে...

প্রমোদ কাননে পিকনিকে জড়ো হওয়া পুরুষ ও রমণীদের কেউ কেউ যে অনিমেষের পেছনে লাগতে চাইছে, সে তো বোঝাই যায়! কিন্তু কিছুটা চোর-চোর হয়ে যাওয়া অনিমেষের চিত্ত এখন বিচিত্র এক ভিন্নমুখী বোঁচকার দিকে। ঠিক দুক্কুরবেলা এতগুলো পুরুষ-রমণীর সামনে মল্লিকাদি ওকে ঠিক বাচ্চাদের মতন গাল টিপে আদর করেছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে। গোঁফ-দাড়ি টানাটানির স্কোপ ছিল না। স্ত্রী-র কথা শুনে গোঁফ-দাড়ি ক্লিন হয়ে এসেছে ভাগ্যিস! কিন্তু মাথার চুল যে বেড়ে গেছে অনেকটাই। সেটাও এলোমেলো করে দিতে দিতে মল্লিকাদি যেন বা স্নেহের সুরেই বলছিল, অনি কি আর আমাদের সেই অনি আছে?

ততক্ষণে ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে যেতে অনিমেষের শরীরে যা যা স্বাভাবিক পরিবর্তন তা হতে শুরু করেছে। বউ তো খুব দূরে নয়, ওই তো দশ হাত দূরে আরও দু-চারজন ভদ্রমহিলার পাশাপাশি; কিন্তু মল্লিকাদি ডোন্ট কেয়ার। এ ছোকরা কলেজে কয়েক ব্যাচ জুনিয়ার অনি, নাকি বউয়ের মেক, সে বিষয়ে যেন ভাবনাই নেই কোনও।

স্রেফ একা যেন টাইম ক্যাপসুলে ঢুকে পড়েছে কলেজ জীবনের স্মৃতি-সত্তা কল্পনা করতে করতে। পিকনিকের আসরে আপাতত কিছুক্ষণের এলোমেলোমি। দুপুরের খাবার তৈরি, তাই অন্ত্যক্ষরী, হাঁড়ি ফাটনোর খেলা, মাইকে গান বা আবৃত্তি আপাতত মুলতুবি। এখন কে বসবে ফার্স্ট ব্যাচে, কার বা কাদের কাছাকাছি, ভোজনের অগ্রে থাকা ভালো হলেও পিকনিকের শেষ পাত অধিক উপযোগী লাভজনক কি না— কেননা এই তো সবে প্রাতঃরাশের পালা চুকল—এমনধারা কথাও বলছে কেউ কেউ। আর এসবের মধ্যে মল্লিকাদি কি না উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুরু করেছে, যে অনির ছবি কাগজে বেরোয়, এটা আমাদের সেই অনিটি কি না, টিপে-টুপে দেখে নিচ্ছি!

এতক্ষণ ধরে অনেকটা সময় কিন্তু অনিমেষ বউ-সহ মল্লিকাদির পাশাপাশিই ছিল। স্কটিশচার্চ কলেজে সব্বাই সতীর্থ, মেসো-পিসে- জ্যাঠা, পিসি-মাসি সক্কলে, দিদি-ফিদি মানি না, এই অ্যাটিটিউডটা প্রসঙ্গক্রমে মল্লিকাদির কাছে নিজের বলে চালাতে চালাতে, এই রে বউ আবার খচেমচে যাচ্ছে না তো?...এই কথাটা ভেবেছে। নাঃ, বউ বোধহয় বেশ পছন্দই করেছে মল্লিকাদিকে। দিব্যি হাসছে তার নানারকম কথাবার্তায়। মল্লিকাদির বাবা ওদের সবার প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন। অনুজ, অগ্রজ—যেই হোক, মল্লিকাদির কাছাকাছি থাকা একই ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা তাঁর নিত্য স্নেহের পাত্র। সেই ভদ্রলোকের অবসৃত জীবন এখন কেমন কাটছে, তা নিয়েই বেশি কথা হচ্ছিল। বউ ভালোবাসে যে কোনওরকম বাবার গল্প শুনতে।

কিন্তু, ইদানীং কেউ কেউ অনিমেষকে তার বাবা বলে ভুল করছে দেখে বউ বেচারি বিষম ক্ষিপ্ত। প্রায় সাশ্রুনয়নে অনুযোগ করেছে, নিজের চেহারাটা তো আর আয়নায় দ্যাখো না! আমাকে যে কতরকম প্রশ্নের জবাব দিতে হয়...

—কী জবাব? বই থেকে মুখ না তুলে অনিমেষ বলে।

—তুমি এত সাদা কেন! চুলেটুলে রং করো না কেন...

—লা জবাব। একই সুরে বলে অনিমেষ। হয়তো হাতের বইটার রঙিন কোনও আবেগে, হয়তো বা বউয়ের এমন মুষিকপ্রসব-মার্কা প্রসঙ্গ উত্থাপনে। মেয়েমানুষের এবম্বিধ কথার জবাব দেওয়া পুরুষের পক্ষে বাতুলতা; শরৎবাবুর শ্রীকান্ত-বৃত্তান্তের এক সিংহপুরুষেরই মতন ভাবে অনিমেষ, তবে বলে না যে যারা এসব বলে, তাদের ল্যাজ কেটে দাও! বউ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে অনুযোগ করে যে দুনিয়ার বুড়োবুড়ির সঙ্গে মেলামেশা করেই তার বরের এই দুর্দশা।

অনিমেষ অনেকবার বোঝাতে চেয়েছে যে লেখাজোখা আঁকাআঁকির জগতে সবটাই যৌবরাজ্য। শতবর্ষ আগের শিল্পীও সেখানে বন্ধু! বউ আরও ঘাবড়ে গেছে। এটা অবশ্য বউয়ের কাছে অনিমেষ স্বীকার করেছে যে অগ্রজদের, বিশেষত ভিন্ন জেন্ডারের কেউ হলে অতটা স্নেহ হজম করা অনেক সময়েই কঠিন—বিস্তর ধাক্কাগুঁতো খেয়ে মেনে নিতেই হয়েছে যে মেয়েরা যে কোনও বয়েসেই, নিতান্তই ফিজিক্যাল এলিমেন্ট। শরৎচন্দ্রীয় পুরুষপুঙ্গবের মতনই আন্দোলন করেছে অনিমেষ, একদিন তসলিমার মতন লিখে দেব, ফাটিয়ে লিখে দেব সব...

বাস্তবতাগুলো বউ বোঝে। কোনও প্রৌঢ়া তো হঠাৎ দেখায় গৌরকান্তি শুভ্রকেশ অনিমেষকে নিজের স্বামীর সিংহাসনে বসিয়ে কিছুটা ধাক্কা'গুতো দিতেই পারে—ছোকরা যে ভিন্ন প্রজন্মের, তা বুঝে ওঠার প্রাক্কালে! দোষ তো অনিমেষেরই, একাধিক প্রজন্মের রমণীকুলের স্নেহের ভিখারি হয়ে চেহারাটা এমন করেছে কেন?

কৌতুক-আদরের ছলে নানান সত্য বোঝাতে চেয়েছে অনিমেষের বউ, সমস্ত প্রজন্মেই যা সত্যি।

—দ্যাখো, এখন তো ঘরে ঘরে বাচ্চা একটি বা দুটি, তাই তাদের বাচ্চা বানিয়ে রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা মা-বাবাদের। নইলে তারাও যে বুড়ো হয়ে যায়! কিন্তু আগেকার দিনে দ্যাখো, ঘরে ঘরে, বছরে বছরে বাচ্চারা আসত। আসত একই সঙ্গে মায়ের কোলে, মেয়ের কোলে। তোমরা আমার মাতৃকুল-পিতৃকুলেই দ্যাখো না, কত সমবয়সি মামা-কাকা-মাসি-পিসি। কী দারুণ কোলাহল, কত ঝগড়াঝাঁটি, খেলাধুলো, কত মজা তখনকার দিনে! তাই বলে সম্পর্কগুলো তো কেউ অস্বীকার করেনি। মামা-কাকু-পিসি কিংবা দাদু-ঠাকুর্দা-দিদিরা তো বন্ধুই। একদিন আগেও যার চোখ ফুটেছে এই পৃথিবীতে, সে তো একটা দিন অন্তত বেশি দেখেছে সবকিছু!

—সেজন্যেই তো বড়দের সঙ্গে মিশতে হয়। বুঝতে চেষ্টা করি তাঁরা কী দেখেছেন। আমার যদি তা দেখার সুযোগ না-ই ঘটে কখনও ...যেভাবে অনেক পুরনো কালের বই বা ইতিহাস পড়ে আমরা এইসময় বা ভবিষ্যৎকে বুঝতে চাই...

কর্তা ফের বিমূর্ত দিকে কথা ঘোরাচ্ছে দেখে, বোর হয়ে বউ এবার কর্তার সমবয়সি ক্লাসমেট বান্ধবীদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেন। সমান বয়সিদের চলন বলন চিন্তনেও যে জেনারেশন গ্যাপ থাকে, সেসব কোনও কর্তাই কোনওকালে গিন্নিদের বোঝাতে পারেনি—বিশেষত বউ যখন প্র্যাকটিক্যালি গাল পাড়ছে, আঃ হা, এটা বোঝো না যে নিজেদের বরদের ট্যাকল করতে করতে বোর হয়ে ওরা তোমার মতন একটা নধর নির্বোধ পাঠাকে নিয়ে খেলতে চায়?

তা তুমিও একটা নধর কচিপাঁঠা জোগাড় করে নাও না!... অনিমেষের উচিত ছিল এই কথাটাই বউকে বলা, কিন্তু বউ তেড়েমেড়ে বলে চলেছে, ওদের ছেলে-মেয়েরা আরেকটু বড় হয়েছে। হাতে অনেক সময়, আর বরেরাও তো তোমার চেয়ে কিছুটা অন্তত আগে জন্মেছে, এটা তো মানবে? কিন্তু দ্যাখো, সারাক্ষণ তাদের মুখে কেবল গ্যাস-অম্বল-কোলেস্টেরল আর সুগার-প্রেশারের কথা। তুমিও যে একটা বিপজ্জনক বয়েসে পৌঁছেছ, সেটা অন্যের মুখে শুনে আমার ভালো লাগে, বলো? ওদের বরেরা কী সুন্দর স্মার্ট, ফিটফাট, টিপটপ। এই হাউসিংয়ে দ্যাখো না! সে তুলনায় কী এমন বয়েস হয়েছে তোমার?

বউয়ের মুখে আমরা-ওরা প্রসঙ্গ বিপজ্জনক, তাকে দীর্ঘায়িত হতে না দিয়ে, অনিমেষ সমর্থনসূচক ভাবেই বলতে চায়, অসুখের কথায় অসুখ বেড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক তো ঠিক বয়েস মেনে আসে না! সেভাবে হিসেব করে মিশতে গেলে বউয়ের ক্লাসমেটের বউও তো আমাদের বুড়োবুড়ি বলতে পারে। আমি আসলে মানুষের অন্তরটা অনুভব করতে চাই, যাকে বাইরের চেহারা নষ্ট করতে পারে না...

'মাথা খাও, রোদ্দুরে যেও না'র সুরে বউ ফরমান জারি করে, কথা দাও, রোজ দাড়ি কাটবে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরবে...

—আর বুড়োবুড়িদের ছেড়ে ছোঁড়োছুঁড়িদের সঙ্গে মিশব, যাতে ওরা বলতে পারে বুড়োটা শিং ভেঙে আমাদের দলে ভিড়েছে, তাই তো?

এসব গতকালের কথা, আর আজই পিকনিকে কি না মল্লিকাদির এমন প্রমোদ! অবশ্য অনিমেষও তো আমোদিত হয়েছে। এক লহমায় ওর চিত্তপটে ফিরে এসেছে কলেজের উচ্ছল-চপল দিনগুলো। তখনকার

দিনে, টেস্ট ম্যাচে স্টেডিয়ামের বেড়া টপকে, বাউন্ডারির থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে ব্রিজেশ প্যাটেলকে চুমু খেয়েছিল এই তরুণী। ওদের কলেজেও, মেয়েদের মধ্যে, চ্যালেঞ্জ নিয়ে হতো এসব ব্যাপার- স্যাপার। অনিমেষের কাছাকাছি অঞ্চলেই থাকা অন্য ডিপার্টমেন্টের একটি মেয়ে গট আপ গেম খেলেছিল—শোন, হঠাৎ ধাক্কায় পড়ে যাস না যেন... ঠিক ওই সময়ে ওই জায়গায় ব্যাপারটা হবে। কিছু ভাবিস না, আমি তো আছি! আর মিউচুয়াল কনসেন্টে এসব হলে-টলে ইউনিয়ানও মাথা ঘামায় না, রাস্টিকেট করা তো দূরের কথা। নিজেকে স্টিফ করে রাখিস না, তাহলে ব্যথা লাগবে। তারপর তো চাচার হোটেলে হাফাহাফি ফাউল কাটলেট...

আমোদের নানান স্মৃতিতে অনিমেষও যেন ঢুকে যাচ্ছে সেই টাইম ক্যাপসুলের মধ্যে। আনন্দ-অভিজ্ঞতাগুলো ঘুরে-ফিরে আসলে তো একই রকম। এই গঙ্গাতীরে প্রমোদকাননেও যেমন...

মল্লিকাদি, ছেলেদের দাড়ি রাখা-না-রাখা নিয়ে, মাচো আর মেট্রোসেক্সুয়াল লুক-এর তুল্যমুল্য কত কী বলে যাচ্ছে। অনিমেষ পায়ে পায়ে সরে এল। ওর বউও এখন একদম অন্য একটা সার্কেলে, বেশ তো হাসিখুশিই দেখাচ্ছে এখনও অবধি। যাক বাবা, ওদিকে এগিয়ে কাজ নেই। বিয়েবাড়ি-টাড়িতে বউ থাকবে আরেকটা বরের পাশে, আর এর বরের পাশে থাকবে আরেকটা বউ, বুঝলে? অনেকদিন আগে কানে যাওয়া বউয়ের নির্দেশ, উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্ঘোষেরই মতন অনিমেষের প্রাণে বাজে। এই তো, এই যে অবশেষে চমৎকার একটা সঙ্গী পাওয়া গেছে! তারাপদ। নামটা প্রাচীন, চেহারাটাও সব সময়ে মাফলার জড়িয়ে থাকার জন্যে প্রাচীন গোছের। তাতে কী? মাধ্যমিক তো পাশ করেছে ওর দু-তিন বছর পর। স্কুলে ইতিহাস পড়ায় আর কবিতাও লেখে বেশ ভালো। বউটিও তার সুন্দর, ছোটখাট। যমজ মেয়ে ওদের, দেখতে আলাদা, সব মিলিয়ে, মেলামেশার পক্ষে মজাদার। এদিকে আহার আয়োজনও সম্পূর্ণ। বসে পড়লেই হয়।

বউ যে দলটার সঙ্গে, তারা 'এখন না বসলেও হয়' গোছের ভাব করছে। যা ইচ্ছে তাই করুক গে। বাড়িতে তো বেলা করেই খেতে অভ্যস্থ! বউকে দেখিয়ে দেখিয়েই অনিমেষ বসে পড়ল তারাপদর স্ত্রী-র পাশের আসনটিতে। ওধারে দুই যমজ মেয়ে, ওদের খাদ্যাভ্যাসও একইরকম কি না—এ নিয়ে হালকা কথাবার্তাও হলো।

মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, মুগ্ধকর পদ। কিন্তু কাঁটা বেছে খেতে বেশ সময় লাগে অনিমেষের। রান্নার প্রশংসা শোনা যাচ্ছে ইতস্তত। হঠাৎ তারাপদ কেমন যেন ছিলে-গুঁড়ো ধনুকের মতন লাফিয়ে উঠল। তারপর কোথায় যেন দৌড় লাগালো।

হলোটা কী? অনিমেষ ভাবলেও, বেচারি বউটি উদাসীন।

ডালের পর এঁচোড়ের ডালনা শেষ, এমনকী মাংসও এসে গেছে অভঙ্গুর সাদা শোলার বাটিতে। অনিমেষের পাশ থেকে বেচারি বউটি বলে, ওর কিন্তু মাংস বাদ, শুধু মাছ।

কিন্তু আসনের মানুষটিই কে ভ্যানিস! পাতে ভাত-ডাল-এঁচোড়- আলুভাজা সব জমছে। অস্বস্তিতে অনিমেষের খাওয়াটা জমছে না। ওভাবে দৌড়ে গেল কোথায়? আকস্মিক প্রকৃতির ডাক? উঁহু, সে তো অন্যদিকে, ওই বিল্ডিংটার ভেতর বোধহয় ওনলি ফর লেডিজ। তবে কি আরও গুরুতর কিছু? অনিমেষের উৎকণ্ঠা দেখে যমজ কন্যারাও উৎকণ্ঠিত। ওদের মা যেন বলল, বাবাই তো ওদের খাইয়ে দেয়।

যাকগে, হিসেবমতন তো তারাপদর বসার কথা অনিমেষের বউয়ের পাশে। নাহয় পরের ব্যাচেই বসত। এভাবে মাঝখানে উঠে গেল, যারা দিচ্ছে, তাদেরও তো অসুবিধে! ক্যাটারার দলের কেউ কেউ অপছন্দের চোখে অনিমেষের দিকে তাকায়। যেন ও-ই কোনও খোঁচা-টোঁচা মেরেছে বলে তারাপদ পালিয়ে পগারপার।

নাঃ, ওই তো দেখা যাচ্ছে দূরে তারাপদ হেঁটে আসছে হেলেদুলে, হাসিমুখে। এদিকে মাংস পোলাও ফুরোতে চলল, এবার পাতে পড়বে চাটনি। তারাপদর স্ত্রী

হারে-রে-রে করে বাধা দেয়—ওর চাটনি বারণ, বারণ!

—গিয়েছিলে কোথায়? অনিমেষের গম্ভীর প্রশ্ন। তারাপদ একবার অনিমেষের দিকে, আরেকবার নিজের বউয়ের দিকে চেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে হাসে। চোখে চোখে ভাব-বিনিময়। ছোটখাট বউটি বলে, ও-ও-ও, বুঝেছি। খাওয়ার আগের ওষুধটা ভুলে গিয়েছিলে, তাই না? মানে বুঝলেন না, প্রচণ্ড সুগার তো। শেষ বাক্যটা, অনিমেষকে বলা। তারপরই, কথা ছোঁড়া হলো ক্যাটারারদের দিকে—এই যে ভাই, এক পিস মাছ যদি...

অভুক্ত আলুভাজা, এঁচোড়, মাংস, চাটনি, রসগোল্লার পাশে উদাসীন হয়ে যেতে যেতে উৎকণ্ঠিত অনিমেষ আরেকবার ভাবে, এসব প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমের জন্যেই শতবর্ষ দূরের ব্যক্তিত্বের বন্ধুতা দরকার। বউরা না বুঝল, বয়েই গেল! ■

মাছরাঙার স্কুল

একদিন সকালে আমি নদীর ধারে গাছের নীচে বসে আছি। এমন সময় একটা মাছরাঙা উড়ে এসে নদীর অন্য পাড়ে মাটির ভিতর কোথায় ঢুকে গেল। সেখানে মাটির নীচে একটা একটা গাছের শিকড়ের আড়ালে লুকানো তার বাসা। বাসার মধ্যে কয়েকটা ছানা আমি চারিদিকে অনেক মাছরাঙা দেখেছি, কিন্তু এতদিন তার বাসাটা দেখতে পাইনি। আমি যখন যেতাম, মাছরাঙাগুলি খুব গোলমাল করে নদীর উপরে উড়ে বেড়াত। মনে হয়, তারা বোঝাতে চাইত যে, তাদের বাসা উপরের দিকে কোথাও হবে।

এতদিনে আমার চেনা মাছরাঙার ছানাগুলো একটু বড়ো হয়েছে। একদিন সকালে একটা ঝোপের আড়ালে বসে মাছরাঙার গর্ত দেখছি, এমন সময় ছানাদের মা ভেতর থেকে উঁকি মেরে চারিদিকে তাকাতে লাগল। নদীর ধারে একটা সাপ শুয়েছিল, মাছরাঙী এক লাফে তার উপর গিয়ে পড়ল, সে তো ভয়ে দৌড়। কিছু দূরে কতগুলো হাঁসের ছানা খেলা করছে, তবু মাছরাঙী ছুটে গিয়ে বকে ধমকে তাদের তাড়িয়ে দিল। পথের মাঝখানে এক ব্যাং রোদ পোহাচ্ছে, মাছরাঙী তাকেও তাড়িয়ে ছাড়ল। তারপর কেউ যদি কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাকে ভয় দেখাবার জন্য খুব জোরে একবার শব্দ করে গর্তে ঢুকে পড়ল।

খানিক পরে দেখি, একটা ছোটো মাছরাঙা গর্তের ভেতর থেকে মাথা বের করছে। পেছন থেকে কে যেন দিল এক ঠেলা। সে অমনি উড়ে নদীর অন্য পাড়ে একটা মরা গাছের ডালে গিয়ে বসল। এভাবে চারটে ছানা গাছের ডালে সার দিয়ে বসল।

তাদের বাবা ভোর থেকে ছোটো ছোটো মাছ ধরে এক জায়গায় জড়ো করছে। সেই মাছ এখন তাদের খেতে দিয়ে সে তার নিজের ভাষায় শেখাতে লাগল এখন তাদের কী করতে হবে।

ছোটো ছোটো মাছরাঙাগুলির এখন মাছ ধরতে শেখা চাই। একটা নিরিবিলি স্থানে তাদের স্কুল বসল। এখানে কম জল, আর জলের নীচে কাদার উপরে মাছ স্পষ্ট দেখা যায়। জলের উপর একটা গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে। বড়ো মাছরাঙা দুটো অনেকগুলি ছোটো ছোট মাছ মেরে ওই ডালের নীচে জলে ছড়িয়ে রাখল। তারপর ছানাগুলিকে এনে ডালের উপর বসিয়ে নিজেরা এক-একবার ডুব দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ছোটো মাছরাঙাদের খিদে পেয়েছিল। কাজেই মরা মাছগুলো ধরতে তাদের উৎসাহের কোনোরকম খামতি হলো না।

এর কিছুদিন পরে একদিন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে একটা ছোটো জলা দেখতে পেলাম। ওই জলের সঙ্গে নদীর কোনও যোগ নেই। জলের মধ্যে কতকগুলি মাছ যেন হঠাৎ কোনও অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে, এই ভাবে ছোটাছুটি করছে। আমি ভাবতে লাগলাম, মাছগুলো কী করে নদী ও ওই জলের মধ্যিখানের জায়গা পার হলো। এমন সময় দেখি যে, একটা মাছরাঙা মাছ ঠোঁটে নিয়ে উড়ে আসতে আমাকে দেখেই ঘুরে অন্য দিকে চলে গেল। তখন মনে করলাম। বুঝি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য আরও কোনও অদ্ভুত উপায় বের হয়েছে। এই ভেবে ঝোপের আড়ালে লুকোলাম। ঘণ্টাখানেক পর মাছরাঙাটা চুপি চুপি এসে একবার সাবধানে সব দিক দেখে আবার ডাকতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে তার সমস্ত পরিবার নিয়ে সেই জলার ধারে হাজির। মাছ ধরা শুরু হলো। ছানাগুলি তাদের মা-বাপকে ডুব দিতে দেখে আর তাদের ধরা মাছের আস্বাদন পেয়ে পেয়ে নিজেরাও ডুব দিতে লাগল। প্রথমবার কিছুই ধরতে পারল না। দু'একটা ধরেই তারা যেন মাছ ধরবার উপায় বুঝে ফেলল। তারপর ঠোঁট নীচের দিকে ও লেজ উপরের দিকে করে টুপ করে জলে পড়ে আর মাছ ধরে।

এরপর আবার যখন মাছরাঙা পরিবারের সঙ্গে আমার দেখা হলো তখন তারা সকলেই খুব মাছ ধরতে শিখেছে। এখন আর আহত বা কয়েদ করা মাছ দরকার হয় না। তারা সকলেই খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমি আগে কখনও মাছরাঙার খেলা দেখিনি।

জলের ওপর তিনটা ডালে তিনটি মাছরাঙা বসেছে। হঠাৎ একসঙ্গে ঠোঁট নীচু করে তিনজনেই ডুব দিল, আবার তখনই উঠে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। সবার মুখে একটা করে মাছ। সেই মাছ গিলবার জন্য তারা বেজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারও বিষম খাবার জোগাড়। এই খেলার উদ্দেশ্য, কে আগে ডুব দিয়ে মাছ এনে গিলতে পারে। যে মাছ পায় না সে বেচারি মুখ ভার করে নিজের ডালে গিয়ে বসে।খেলা শেষ হলে সকলে মিলে নাচে আর নিজের ভাষায় গান করে। এদের জীবনের কাজই হলো খাওয়া আর আনন্দ করা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সংক্ষেপিত)

ভারতের পথে পথে

মালিনীথান

উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল রাজ্যের সিয়াং জেলার মালিনীথানে আবিষ্কৃত হয়েছে ১২ শতকের পাথরে গড়া মন্দির ও ভীষ্মকনগর রাজপ্রাসাদ। পুরাণে আছে, ভীষ্মকনগর থেকে দ্বারকার পথে শ্রীকৃষ্ণ নববধূ রুক্মিণীদেবীকে নিয়ে আশীর্বাদ মাগেন দেবীর। দেবী পার্বতী ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন নবদম্পতিকে। মালার গঠন নৈপুণ্যে প্রীত হয়ে দেবীকে মালিনী নামে সম্বোধন করেন শ্রীকৃষ্ণ। কালে কালে তা মালিনীথান নামে পরিচিত হয়।১৯৭০ সালে জঙ্গল খুঁড়ে এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে কারুকার্যময় দশভুজা দুর্গার প্রস্তরমূর্তি। মালিনীথানের নয়ন লোভন প্রকৃতি মুগ্ধ করে পর্যটকদের।

জানো কি?

- আকবরের সভাসদ বীরবলের আসল নাম মহেশ দাস।
- রাণাপ্রতাপের ঘোড়ার নাম চৈতক।
- সংগীত সম্রাট তানসেনের আসল নাম রামতনু পাণ্ডে।
- ভারত বিভাজনের খলনায়ক জিন্নার পরিবার মাত্র এক পুরুষ আগে হিন্দু ছিল।
- জিন্নার বাবার নাম পাঞ্চুলাল ঠক্কর।
- জিন্নার ঠাকুরদার নাম প্রেমভাই মেঘজী ঠক্কর।
- মহানায়ক উত্তমকুমারের আসল নাম অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভালো কথা

আমার সুন্দরবন ভ্রমণ

বাংলা নববর্ষের দিন আমাদের বাড়ির সবাই সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সোনাখালি লঞ্চঘাট থেকে একটি ছোটো লঞ্চে আমরা সুন্দরবন যাত্রা করি। লঞ্চে বসে সুন্দরবনের অপরূপ শোভা উপভোগ করতে থাকি। গাইডকাকু আমাদের বিভিন্ন গাছ চিনিয়ে দিচ্ছিল। পাড়ে রোদ পোহানো কুমির দেখলাম। আমাদের সাড়া পেয়ে ধপাস করে জলে নেমে গেল। জল খেতে আসা হরিণ দেখলাম। বনবিবির মন্দিরে প্রার্থনা করেছিলাম যেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পাই। বিকেলের দিকে সে আশা পূর্ণ করেছিলেন বনবিবি। গাইডকাকু ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেই দেখি একটা বিশাল বাঘ দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে নজর পড়তেই দৌড়ে জঙ্গলের অদৃশ্য হয়ে গেল। সন্ধ্যায় আমরা সোনাখালি ফিরে এলাম। প্রথমবার সুন্দরবন দেখার মজাই আলাদা।

রূপষা দেবনাথ,অষ্টমশ্রেণী, বিরাটি, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

আমার ঠিকানা

সাত্ত্বিকা ভট্টাচার্য, রাজাপুর, হাওড়া, চতুর্থ শ্রেণী

রাজাপুরে থাকি আমি
উদয়নারায়ণপুর থানা,
পোস্টাফিস জোকা আর
হাওড়া জেলা সীমানা।

মহকুমা উলুবেড়িয়া আর পিন
সাত এক এক দুই দুই ছয়
নামটি আমার লিখে দিলে
ঠিকানা ভুল হবার নয়।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শোকসংবাদ

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া খণ্ডের মুড়লু শাখার স্বয়ংসেবক ও পূর্ব প্রচারক অরুণ কুম্ভকারের মাতৃদেবী পুতুল কুম্ভকার গত ১৬

এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ৬ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

গত ১৬ মে কলকাতা পূর্বভাগের বৌদ্ধিক প্রমুখ জিতেন্দ্র মিশ্রা পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। তিনি মা, স্ত্রী, দাদা, ১ কন্যা ও ১ পুত্র

রেখে গেছেন। তিনি কর্কট রোগ আক্রান্ত ছিলেন। তিনি মূলত উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার বাসিন্দা। চাকরিসূত্রে কলকাতায় এসে স্বয়ংসেবক হন। সেদিন রাতে নিমতলা শ্মশানে তাঁর পার্থিব শরীরের দাহকার্য সম্পন্ন হয়।

* * *

বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ খণ্ডের বামনী শাখার স্বয়ংসেবক অন্নদাশঙ্কর গোপের মাতৃদেবী ক্ষেপুবালা গোপ গত ২২ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ৪ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কোচবিহার নগরের স্বয়ংসেবক সুশান্ত দাসের মাতৃদেবী কস্তুরী দাস গত ১৭ এপ্রিল নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, স্বর্গীয়া কস্তুরী দাসের প্রচেষ্টায় শুরু হওয়া সেবাকাজ তাঁর বাড়িতে চলছে।

* * *

বাঁকুড়া জেলার খাতড়া নগরের স্বয়ংসেবক, খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের সম্পাদক সুভাষ দত্তের মাতৃদেবী অলকারানি

দত্ত গত ১ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার শ্যামনগর শাখার স্বয়ংসেবক সুপর্ণ মজুমদারের পিতৃদেব বিকাশচন্দ্র মজুমদার গত ৮ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি স্ত্রী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ সেবা প্রমুখ তুফান মাহাত'র বাবা সুরেন্দ্রনাথ মাহাত গত ১২ মে ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়ার গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ জেলার গোলাপগঞ্জ খণ্ডের চরিঅনন্তপুর মণ্ডল কার্যবাহ হেমন্ত মণ্ডলের বাবা শ্রীচরণ মণ্ডল গত ১ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ২ পুত্র,৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া জেলার সেবা প্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা প্রিয়ার শুভ বিবাহে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর মা জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলাকার্যবাহ তরুণ নায়েক-সহ বহু কার্যকর্তা স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

বাঁকুড়া নগরের পূর্বতন জেলা ব্যবস্থাপ্রমুখ সুপ্রভাত বরাট তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সায়ন্তন বরাটের শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে বাঁকুড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল, পূর্বতন জেলা প্রচারক শ্রীকান্ত নন্দী-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধানিধি

গত ১২ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার খাতড়া মহকুমার পূর্ব বৌদ্ধিক প্রমুখ, বর্তমানে খাতড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরের সম্পাদক সুভাষ দত্ত তাঁর মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। শ্রাদ্ধবাসরে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

ভাবের ঘরে চুরি

অমিতাভ সেন

সদাবন্দনীয় অধ্যাপক হরিপদ ভারতী মহোদয় আমার ছাত্রজীবনের প্রিন্সিপ্যাল। তিনি বলতেন— শিল্পের স্বাধীনতা আছে, শিল্পের আছে মুক্তি, উপায় নেই শুধু শিল্প অনুভবীর; আর্ট ব্র্যান্ডিংয়ের যে পাঁচন-ই খাওয়ানো হোক না কেন, গিলতে তাঁকে হবেই! গরল বা অমৃত কোনওটাই তাঁর অধিকৃত নয়।

Art for Arts Sake শীর্ষক বিতর্ক সভায় এটাই ছিল তাঁর মন্তব্য। সেটা ৬৮ সাল। চারিদিকে নকশালি দৌরাত্ম্য। অনেকের মাঝে আমরা গুটিকয় এবিভিপি সদস্য জোট হয়ে বসে আছি। স্যরের সকল কথা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার ছিল না। কিন্তু চির মধুনিস্যন্দী শব্দাবলী আজও কানে বাজে। অবশ্য শিল্পবোদ্ধা সাধারণের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ একবার দেখেছিলাম। বারাণসীর বালবিধবাদের

সমস্যার প্রেক্ষিতে একটা ফিল্মের শ্যুটিং চলছিল গঙ্গার ঘাটে। স্থানীয় জনসাধারণের সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল (পদ্মাবত ফিল্মায়নের সময়ও একই অনুরোধ রাখা হয়েছিল) চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তু ইতিহাসসিদ্ধ কিনা বিশেষজ্ঞ জনের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হোক; কেননা সাধারণ মানুষের একটা ধারণা হয়েছিল বালবিধবাদের বেশ্যারূপে দেখানো হচ্ছে। বামাচারী চিত্রপরিচালক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সাধারণ মানুষের বিনয় পরিণত হলো ক্রোধে; প্রেক্ষাপটে ছিল পূর্বমাতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের আশঙ্কা। জনগণের প্রতিরোধে ফিল্মায়ন সম্ভব হয়নি। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার পরিচালককে ডেকে এনেছিল কলকাতায় ছবি করার জন্য। মাথান্যাড়া শাবানা আজমি গলায় গাঁদার মালা পরে ক্যামেরার সামনে বসে পড়েছিল। বাবুঘাটে সমবেত মানুষের প্রতিবাদ দেখে পরিচালক শিল্পীর স্বাধীনতাকে শিকেয় তুলে রেখেছিল।

কিন্তু মিলন ভৌমিকের পরিচালনায় 'দাঙ্গা দ্য রায়ট' যে ফিল্মটি দর্শকদের উপহার দেওয়া হলো সেটা কোনও হলে দেখানো হয়নি। কারনি সেনারা যখন 'পদ্মাবত' প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন— তাঁদের নিন্দা করে বহু বাতি কলকাতায় জ্বলেছিল। অন্যদিকে দাঙ্গা দ্য রায়ট ছবিটা দর্শকদের চোখের আলোয় এলো না। তার বিরুদ্ধে কোনো বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদ করেননি, হয়তো অনুব্রতর ধৃষ্টতায় বরেণ্য কবি শঙ্খ ঘোষের অপমানিত হওয়া দেখে অনেকে চুপ থাকাকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস তো চুপ করে থাকে না। ৪৬ সালের ১৯ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশানের আগের দিন নরখাদক জিন্না বলেছিলেন— If I have a revolver I must use it. সেই কারণে বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশকে বেছে নিয়েছিলেন। মুসলিম লিগ প্রত্যেকটি রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেসের কাছে হেরেছিল। মনুমেন্টের মিটিংয়ে শাহিদ সুরাবর্দির সঙ্গে জ্যোতি বসু ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অংশ নিয়েছিলেন। স্লোগান উঠেছিল— 'নারা এ তকদির, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। তার পরদিন হাওড়ার রেলওয়ে সাইডিংয়ের গুণ্ডা মিনা পেশোয়ারি, রাজাবাজারের তাসিন শেখ, আক্রাফটকের জামির মুল্লা সারা কলকাতায় নরসংহার চালিয়েছে। মধ্য কলকাতায় গণিতবিদ যাদব চক্রবর্তীর বাড়ি, অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের নিবাস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কলাবাগান বস্তি, কলুটোলায় মৃতদেহের পাহাড়ে পরিণত হয়। শকুন মানুষের মাংস খেতো। শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ দত্ত সেদিনের ফোটোগ্রাফ তুলে রেখেছেন। প্রথম কয়েকদিন সমস্ত হিন্দু পুলিশ অফিসারকে ছুটিতে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

শ্রদ্ধেয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হাওড়ার জানু বোস, শ্রীরামপুরের রাম চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। তাই হিন্দুসমাজ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আর সবার ওপরে ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শুধু হিন্দুসমাজ নয়। ড. শহীদুল্লাহ, বরহমপুরের অধ্যাপক রেজাউল করিম প্রমুখ বিদ্বজ্জন এই একতরফা হিংসার বিরুদ্ধে শ্যামাবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এর পরই চলে এলো নোয়াখালির দুরপনেয় কলঙ্ক। নরপশু গোলাম সারোয়ার নির্দেশ দিল— একটা দুটো হিন্দু ধর / সকাল বিকেল নাস্তা কর। তার ভয়ে পালিয়ে এসেছিলেন ড. সুচেতা কৃপালনী মহাত্মাজীর নির্দেশ উপেক্ষা করে। কিন্তু ভয় পাননি অগ্নিকন্যা লীলা রায়। কারণ পর্বতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। মুর্শিদাবাদ জেলা পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিল। গর্জে উঠলেন বাংলার শার্দুলসন্তান— আজ সেই জেলা উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের যোগসূত্র— Jinnah divided India, I divided Pakistan, কাশ্মীরেও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল।

'দাঙ্গা দ্য রায়ট' চিত্র পরিচালক মিলন ভৌমিক ভয়ঙ্কর হিংসা ও পরিত্রাণের ইতিহাস দেখিয়েছেন। তাই তৃণমূল সরকারের এতো গাত্রদাহ। সত্য যে কঠিন, তাই কঠিনের মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয় তোষণবাদীদের পক্ষে। এই প্রসঙ্গে নিবেদন রাখি : পদ্মাবত ফিল্মের যে রিল পাকিস্তানে দেখানো হয়েছে, সেখানে আলাউদ্দিনের পাশব খোয়াব দৃশ্য আছে। ■

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

1977

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৩৯তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ২৪শে জুন ২০১৮

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

আওরঙ্গজেবকে জাতে তোলার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা শুরু করেছে ছদ্ম সেকুলাররা

বিনয়ভূষণ দাশ

ইদানীং কলকাতার কিছু দৈনিক সংবাদপত্র—বাংলা এবং ইংরেজি—মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং মহীশূরের সুলতান টিপু সুলতানকে 'সেকুলারবাদী' জাতে তোলার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা শুরু করেছে। ভারতবিরোধী অন্যান্য অপপ্রচারের মতো এক্ষেত্রেও বাজারি পত্রিকা কয়েক কদম এগিয়ে। এরই সঙ্গে আছে কিছু তথাকথিত মার্ক্সবাদী ও তাঁদের ফেলো ট্রাভেলার ব্যক্তিবর্গ। সম্প্রতি প্রাক্তন আই.এ.এস. জওহর সরকার ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক সুব্রত মুখোপাধ্যায় দৃষ্টিকটু ভাবে আওরঙ্গজেবের ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণে উঠে-পড়ে লেগেছেন। স্বয়ং আওরঙ্গজেবও এসব দেখলে ও শুনলে কবরের মধ্যেই উঠে বসতেন থতমত খেয়ে। আর মধ্যযুগের ইতিহাসের আকর গ্রন্থের রচয়িতাগণ লজ্জায় অধোবদন হতেন। আমিনুল ইসলাম নামের বাজারি পত্রিকার এক পত্রলিখিয়েও এঁদের উপযুক্ত দোসর হয়েছেন।

সম্প্রতি প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সি.ই.ও., জওহর সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শিক্ষা বিভাগ আয়োজিত 'ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন : একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ' শীর্ষক বক্তৃতায় ইতিহাসবিদ্‌দের অনুরোধ করেছেন—'মিথ ভাঙুন, ৫ পাতা ইতিহাস লিখুন রোজ।' কেমন ইতিহাস লিখবেন সেটাও বলে দিয়েছেন জওহরবাবু। যেমন, আলাউদ্দিন খিলজি হুন আক্রমণ না রুখলে ভারত মরুভূমি হতে পারত, আওরঙ্গজেবের বারাণসী মন্দির ধ্বংসের মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষের গন্ধ খোঁজা অবান্তর ইত্যাদি। তিনি আরও বলেছেন, 'এ দেশের ইসলামি শাসনপর্বে কালি লেপে একতরফা পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসের প্রচার চলছে।' ইত্যাকার আরও অনেক অমৃতবাণী। কাশীতে নাকি বিশ্বনাথ মন্দিরে রাজবিরোধী শক্তিকে ঠেকাতে ব্যবস্থা নেন আওরঙ্গজেব! রাজবিরোধী শক্তি ঠেকাতে মন্দির ধ্বংস, দেবমূর্তি অপবিত্র ও ধ্বংস করা? এটা কোন ইতিহাসে আছে জওহরবাবু জানাননি। মোগল যুগে লেখা কোন ইতিহাসে জওহরবাবু পেলেন যে, আলাউদ্দিন হুনদের রুখেছিল? আলাউদ্দিনকে জাতে তুলতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের বিকৃতি করলেন। হুনেরা গুপ্ত রাজত্বে ভারত আক্রমণ করে এবং গুপ্ত সম্রাট স্কন্দ গুপ্ত তাঁদের তাদের আক্রমণ

> মার্কসবাদী ও আলিগড় পন্থী ঐতিহাসিকেরা সরকারি টাকায় ইতিহাস বিকৃত করে চলেছেন। তাঁদেরই বিভিন্ন উক্তিতে ভারতবিদ্বেষীরা পেয়ে যাচ্ছে তাঁদের অপপ্রচারের রসদ। বি.এন.পাণ্ডে, রোমিলা থাপার, পট্টভি সীতারামাইয়া, শ্রীরাম শর্মা, ইরফান হাবিব, সুশীল চৌধুরী, অতীশ দাশগুপ্ত, শিরিন মুস্‌ভি, সব্যসাচী ভট্টাচার্যদের রচিত ইতিহাস ভারতবিরোধীদের ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

প্রতিহত করেন। এ ঘটনা ৫ম শতাব্দীর; হুনেরা পরবর্তীকালে রাজপুত, তারা হিন্দুসমাজে পুরোপুরি মিশে যায়—এক দেহে লীন হয়ে যায়। আলাউদ্দিন খিলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসে। পঞ্চম শতাব্দীর হুনেরা আর কোথায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর আলাউদ্দিন খিলজি!

প্রায় সাতশো বছরের ব্যবধানের দুটি চরিত্রকে জওহরবাবু একই সুতোয় গেঁথে দিলেন অপূর্ব সেকুলারি দক্ষতায়। ধর্মনিরপেক্ষতার মাদকে এইসব সেকুলারিদের তালও থাকছে না, হুঁশও থাকছে না। অবশ্য, সেকুলারি কড়োয়ার পানি পান করলে কারই বা কাণ্ডজ্ঞান বা হুঁশ থাকে!

শুধুমাত্র একটি প্রবন্ধে এই দুজনের হিন্দুবিরোধী সেকুলারি ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মুসলিম মানসিকতা নিয়ে বেলজিয়ামের ইতিহাস গবেষক ড. কোয়েনর‍্যাড এলস্ট্-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দিকে দৃষ্টিপাত করব। ড. এল্সট্ তাঁর Negationism গ্রন্থে মুসলমানদের মানসিকতা নিয়ে মন্তব্য করেছেন—'The last jihad against the Hindus before the full establishment of British rule was waged by Tipu Sultan in the beginning of the 19th Century. In the rebellion of 1857, the near-defenet Muslim dynasties (Moghuls, Nawabs) tried to cwooy favour with their Hindu subjects and neighbours, in order to launch a joint effert to re-stablish their rule. For instance, the Nawab promised to given the Hindus the Ram Janmabhoomi Babri Masjid site back in an effort to quench their anti-Muslim animosity and redirect their attention wards the new common enemy from Britain. This is the only conceasions to the Hindus. After that, all the concessions made for the sake of communal harmony were a one-way traffic from Hindus to Muslim.' হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কে এর চেয়ে সত্য মন্তব্য হতে পারে না। যদিও, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে হিন্দুরা ঐক্য স্থাপনে জোর দিলেও উত্তর ভারতের বিভিন্ন নবাব, তহশিলদার নিজের নিজের ক্ষেত্রে ঐক্যবিরোধী কাজই করেছে এবং বিদ্রোহ চলাকালীনও হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তাঁরা উচ্চ-নীচ, ধনীদরিদ্র, হিন্দুদের মধ্যে কোনও তফাত করেনি। কারণ তাঁদের কাছে ধনী মূর্তিপূজক আর দরিদ্র মূর্তিপূজকের কোনও তফাত ছিল না; কোরান অনুযায়ী, আল্লাহ সমস্ত মূর্তিপূজকদের জন্য একই ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক যিনি ইদানীং পত্রিকান্তরে ইতিহাস নিয়ে লেখালেখি করছেন তিনি সম্প্রতি এক প্রবন্ধে কুখ্যাত মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্তুতিতে লিখেছেন যে, আওরঙ্গজেব বাস্তবিক উদার, ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি প্রখ্যাত মুঘল ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকারের নাম উল্লেখ করে তাঁকেও কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ স্যার যদুনাথের কোনও পুস্তক থেকে একটিও উদ্ধৃতি বা উদাহারণ দিতে পারেননি। স্যার যদুনাথের উল্লেখ করে যে বিষয়গুলির কথা বলেছেন তার একটিও স্যার যদুনাথ অথবা মধ্যযুগের কোনও ইতিহাসে নেই। মুঘল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যদুনাথের মূল্যায়ন হলো, মুঘল শাসনযন্ত্র পুরোপুরি পারস্য থেকে ধার করা এক মডেলের উপর স্থাপিত। ধার করা মোগল বিচারব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত। স্যার যদুনাথ একস্থানে বলেছেন, 'কাজির কোনও কুকুর যদি মারা যায় তাহলে সারা শহর শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর যদি কাজি নিজে মারা যায় তাহলে কেউ যায় না।'

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, মোগল যুগে আইনের সামনে সবাই সমান ছিল। এ তথ্য তিনি কোথায় পেলেন? বিদ্যালয়ের ছাত্ররাও জানে, মোগল যুগে 'জিম্মি' ও 'সুন্নি' অর্থাৎ অত্যাচারিত ও অত্যাচারী এই দুই ভাগে সমাজ বিভক্ত ছিল। 'জিম্মি'দের জন্ম থেকে শ্মশানে যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন করভারে জর্জরিত করা হতো।

মার্কসবাদী ও আলিগড় পন্থী ঐতিহাসিকেরা সরকারি টাকায় ইতিহাস বিকৃত করে চলেছেন। তাঁদেরই বিভিন্ন উক্তিতে ভারতবিদ্বেষীরা পেয়ে যাচ্ছে তাঁদের অপপ্রচারের রসদ। বি.এন.পাণ্ডে, রোমিলা থাপার, পট্টভি সীতারামাইয়া, শ্রীরাম শর্মা, ইরফান হাবিব, সুশীল চৌধুরী, অতীশ দাশগুপ্ত, শিরিন মুস্‌ভি, সব্যসাচী ভট্টাচার্যদের রচিত ইতিহাস ভারতবিরোধীদের ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

যাইহোক, এবারে 'সেকুলারদের' জাতে নতুন ওঠানো আওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষী সেকুলারি কার্য্যকলাপের কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করব। হিন্দুমন্দির ভাঙার ব্যাপারে আওরঙ্গজেব ও টিপু সুলতান যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। দুজনের মধ্যে আবার আওরঙ্গজেব কয়েক কদম এগিয়ে; কারণ তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল আরও বড়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা মন্দির ধ্বংসের বর্বরোচিত কাজকে খুব আনন্দের সঙ্গেই বর্ণনা করে গিয়েছেন। H.M.Elliot এবং John Dowson সেইসব ইতিহাসের অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন History of India as told by its own Historians গ্রন্থে আট খণ্ডে। এর মধ্যে সপ্তম খণ্ডে আছে আওরঙ্গজেবের বর্বর সেই ধ্বংসলীলার কাহিনি।

আওরঙ্গজেব সম্রাট হবার অনেক আগে থেকেই তাঁর হিন্দুবিদ্বেষী কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। তাঁর পিতা শাহজাহানের সময় থেকেই তীব্র অসহিষ্ণুতার রাজত্ব শুরু হয়; আওরঙ্গজেব সেই অসহিষ্ণু কার্যকলাপ আরও তীব্রতর করেন। তিনি যখন পিতার রাজত্বকালে গুজরাতের শাসক ছিলেন সেই সময় ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে, গুজরাতের চিন্তামণি মন্দিরে গোহত্যা করে মন্দিরটি অপবিত্র ও ধ্বংস করেন এবং এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। ৯ এপ্রিল, ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের এক সাধারণ নির্দেশনামায় আওরঙ্গজেব 'অবিশ্বাসীদের সমস্ত বিদ্যালয় এবং মন্দির ধ্বংস করে সেখানে পুজার্চনা ও পঠনপাঠন বন্ধ করার ফতোয়া জারি করেন।' ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পরের বছরই এক আদেশনামায় মুদ্রায় 'কলমা' লেখার পদ্ধতি বন্ধ করে দেন। কারণ

মুদ্রায় 'কলমা' লেখার পদ্ধতি চালু থাকলে মুদ্রায় অমুসলিমদের স্পর্শে পবিত্র শব্দাবলী অপবিত্র হয়ে পড়বে।

১৬৬৯ সালের ১৮ এপ্রিল সম্রাটের (আওরঙ্গজেবের) কাছে খবর এল যে, থাট্টা, মুলতান এবং বেনারসের মূর্খ ব্রাহ্মণরা তাঁদের মোটা মোটা ছেঁদো বই থেকে কীসব জংলি তত্ত্ব ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে চলেছে। কাফের হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে নাকি অনেক মুসলমান ছাত্ররাও সেখানে ওইসব শিক্ষা করতে যাচ্ছে দূরদূরান্ত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজেব ফরমান জারি করলেন, 'The Director of Faith' (i,e, the Emperar) consequently issued orders to all the governers of provinces to destroy with a willing hand the schools and temeples of the infidels; and they were strictly enjoined to put an entire stop to the teaching and practising of idolatroous forms of worship.' (H.M. Elliot and Dowson, Volume-VII, page, 183-4)

প্রাদেশিক মুসলিম শাসনকর্তাগণ খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে 'ফতোয়া' কার্যে রূপায়িত করলেন। ১৬৬৯ সালের আগস্ট মাসে কাশীর বিখ্যাত বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করা হলো। আর পরের বছর (১৬৭০) আওরঙ্গজেব অত্যন্ত খুশি হলেন জেনে যে, মথুরার বিখ্যাত কেশব রায় মন্দির যেটা জাহাঙ্গীরের আমলে রাজা বীর সিংহ বুন্দেলা তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছিলেন সেটি মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেই মন্দিরের স্থলে এক বিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই খবরে উল্লসিত হয়ে 'মাসির-ই-আলমগিরি' গ্রন্থের লেখক মুস্তাইদ খাঁ লিখলেন, 'Thirty three lacs were expended on this work. Glory to be God, who has given us the faith of Islam, that, in this reign of the destroyeer of false gods, an undertaking so difficult of accompllishment has been brought to a successful termination.' এখানেই শেষ হলো না। মন্দির তো ভাঙা হলো, দেবমূর্তি গুলোর কী হলো? 'মাসির-ই-আলমগিরিতে' লেখা হয়েছে, 'মূর্তিপূজকদের সেইসব মন্দির থেকে যেসব মূল্যবান, রত্নখচিত, দেবমূর্তি পাওয়া গেল সেগুলোকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখানে নবাব বেগম সাহেবার মসজিদের সিঁড়ির নীচে রাখা হলো যাতে করে সত্যধর্মে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসীরা মসজিদে আসা- যাওয়ার সময় সেগুলিকে চিরকাল পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে পারে।'

সোমনাথের দ্বিতীয় মন্দির যেটি রাজা ভীষ্মদেব (১১৪৩-৭৪) তৈরি করেছিলেন, সেটি ধ্বংস করা হলো। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আওরঙ্গজেব কেবল মেবারেই ২৪০টি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। রাজপুতনার যোধপুরে মন্দির ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল খান জাহান বাহাদুরকে। সেখানকার মন্দির ভেঙে কয়েক গাড়ি হিন্দু বিগ্রহ নিয়ে আসা হয়েছিল। উদয়পুরেও এইভাবে অনেক হিন্দু মন্দির ভাঙা হয়েছিল।

ঐতিহাসিক ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার, জে. এন. চৌধুরী, জি. এস. সরদেশাই, স্যার যদুনাথ সরকার, এ. কে. মজুমদার, সীতারাম গোয়েল, কোয়েনরাড্ এলস্ট্ প্রমুখ ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের এই মন্দির ভাঙার তাণ্ডবের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের রচনায়।

অবশ্য শুধু মন্দির ভাঙাই নয়, হিন্দুদের উপর নানভাবেও অত্যাচারের খড়্গ নেমে এসেছিল এই যুগে। সমস্ত ধরনের দ্রব্যের উপর আবগারি শুল্ক ছিল মুসলমানদের ক্ষেত্রে ২.৫ শতাংশ এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫.০০ শতাংশ। কিন্তু মে, ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া হলেও হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা বহাল থাকে। যে সমস্ত হিন্দু ধর্মত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করত আওরঙ্গজেব তাঁদের পুরস্কার ও নানা পদে নিযুক্ত করত। ১৬৬৮ সাল থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের ভেতরে হিন্দুদের সমস্ত মেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকী, হিন্দুদের বিখ্যাত উৎসব দীপাবলীও শহরে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

হিন্দুদের প্রতি আওরঙ্গজেবের এই বৈষম্যমূলক, দমনপীড়নের, ধর্মান্তকরণের ইতিহাস মুছে দেবার এক হীন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে মার্কসবাদী, আলিগড়পন্থী এবং কংগ্রেসপন্থী ঐতিহাসিকদের দ্বারা। যে কোন মূল্যেই একে প্রতিহত করতে হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। History of India as told by its own Historians by Elliot & Dowsons, Vol.VII.

২। History of Auranhgzeb by Sri J. N. Sarkar Vol.III.

৩। History and Culture of India people. by R. C. Majumdar. Vol.VII.

৪। Negationaism in India— Koenrad Elst.

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name : United Bank of India, Branch : Bidhan Sarani

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশনীতি উত্তর-পূর্বের সমৃদ্ধি ঘটাবে : অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশ, মায়ানমার এবং ভুটানের মতো রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সুফল পাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি। সম্প্রতি গুয়াহাটিতে এই মন্তব্য করেছেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ। বিজেপি সভাপতি আশা প্রকাশ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যেভাবে সম্পর্কের উন্নতি সাধন করেছেন, তার ফলে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির অর্থনীতিতে জোয়ার আসবে। সম্প্রতি বিজেপি নেতৃত্বাধীন উত্তর-পূর্বের আঞ্চলিক দলগুলির জোট নর্থ ইস্ট ডেমোক্রাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-র সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে অমিত শাহ একথা বলেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছ'টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা হলেন— নাগাল্যান্ডের নেই ফিউ রিও, মেঘালয়ের কনরাড সাংমা, ত্রিপুরার বিপ্লব দেব, অসমের সর্বানন্দ সোনওয়াল, মণিপুরের এন বীরেন সিংহ এবং অরুণাচল প্রদেশের প্রেমা খাণ্ডু। তিনদিনের এই সম্মেলনে আঞ্চলিক দলগুলির অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বিজেপি সভাপতি বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে স্থল সীমানা চুক্তি করার যে উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী দেখিয়েছেন তার ফলে উত্তর-পূর্বের অর্থনৈতিক উন্নতি করা সম্ভব হবে। আর পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বন্দর দিয়ে উত্তরপূর্বে উৎপাদিত পণ্য পরিবহণ সম্ভব হবে। এছাড়াও এই স্থল সীমানা চুক্তি উত্তরপূর্বে উৎপাদিত পণ্যগুলির জন্য বাংলাদেশের বাজার খুলে দেবে।' প্রধানমন্ত্রীর এই কূটনৈতিক সাফল্যকে অমিত শাহ 'ব্রিফকেস পলিটিক্স থেকে ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্সে উত্তরণ' বলেও আখ্যা দেন।

অমিত শাহ বলেন, '২০১৬ সালে যখন নেডা গঠন করা হয়, তখন অসমে বিজেপি জয়লাভ করে। অসম নির্বাচনের সময় যখন আমি এই অঞ্চলে সফর করেছি, তখনই দেখেছি, উত্তরপূর্বে অন্যান্য রাজ্যে আমাদের দলীয় কর্মীরা তাদের নিজ নিজ রাজ্যগুলি নিয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করছেন। তখনই আমাদের মনে একটি চিন্তা আসে যে, উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি যদি বৃহত্তর ভারতের অংশ হিসেবে নিজেদের ভাবতে চায় এবং তুলে ধরতে চায়, তাহলে সর্বাগ্রে এই অঞ্চলের দলগুলিকে নিয়ে একটি জোট গড়ে তুলতে হবে। এই ভাবনা থেকেই নেডার জন্ম।'

নেডা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক জোট নয়। একটি ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক জোটও নয়। বরং, নেডা হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের মানুষের সমর্থনধন্য ভৌগোলিক সাংস্কৃতিক জোট। এভাবেই সম্মেলনে নেডাকে ব্যাখ্যা করেন বিজেপি সভাপতি।

অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশে'র কথা বলছেন— একমাত্র তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদকে বিনাশ করতে পারবে। অমিত শাহ অভিযোগ করেন, কংগ্রেস শাসনের দুর্নীতি উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে, মাথাপিছু গড় আয় কমিয়ে দিয়েছে।

বিজেপি সভাপতি বলেন, উত্তরপূর্বের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ভৌগোলিক গুরুত্ব সবকিছু থাকা সত্ত্বেও তার উন্নয়ন থমকে ছিল। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন নেডা-র লক্ষ্যই হলো, সমস্তরকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে উত্তরপূর্বের বিকাশ ঘটানো। আমরা মনে করি যখন অবশিষ্ট ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিও নিজেদের ভারতের অভিন্ন অংশ ভাববে— তখনই নেডা গঠনের সার্থকতা বোঝা যাবে। উত্তর-পূর্বের এই নানা ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির ভিতর কেউ কেউ ভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়াচ্ছে তারা। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশের' বার্তা এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কবল থেকে এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মুক্ত করেছে।

সংঘর্ষ বিরতির আবেদন জানিয়েও সীমান্তে পাক গোলাবর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাল্টা মার খেয়ে অবশেষে ভারতের হাতেপায়ে ধরে এবার কাতর আবেদন জানিয়েছে পাক সেনাবাহিনী। সম্প্রতি কাশ্মীর সীমান্তে বিএসএফের পাল্টা আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানি পিকেটের। উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাক বাহিনীর বাঙ্কার। মৃত্যু হয়েছে এক পাক রেঞ্জার্সের। এরপরই পাক রেঞ্জার্সের তরফ থেকে বিএসএফকে ফোন করে গোলাগুলি বন্ধ করার জন্য আবেদন জানানো হয়। এক কথায় বলা যায়, ইটের বদলে পাটকেল খেয়ে পাকিস্তান পথে এসেছে। কিন্তু পাকিস্তান যে পাকিস্তানই, তাকে কোনওভাবেই বিশ্বাস করা যায় না তার প্রমাণ সম্প্রতি আরেকবার পাওয়া গেল। জম্মু-কাশ্মীরের আখনুর সীমান্তে পাকিস্তান আবার সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করেছে। পাক গোলায় মারা গেছে একটি আটমাসের শিশু।

কয়েকদিন আগেকার ঘটনা। জম্মু-কাশ্মীরের আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তান হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছিল। জম্মুর আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তানের এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন দুই ভারতীয় জওয়ান। মৃত্যু হয়েছে কয়েকজন সাধারণ নাগরিকেরও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রীনগর ও জোজিলা সফরের মুখে হামলা আরও বাড়ায় পাকিস্তান। বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তানের এই ধরনের হামলার জবাব দিতেই বিএসএফ মারের বদলে পাল্টা মারের সিদ্ধান্ত নেয়। আর তারপরেই জম্মুর আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাকিস্তানি পিকেট লক্ষ্য করে ব্যাপক গোলাবর্ষণ করে বিএসএফ। বিএসএফের প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে— ভারতীয় গোলার আঘাতে একটি পাকিস্তানি পিকেট সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। বিএসএফের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'পাক রেঞ্জার্সের পক্ষ থেকে ফোন করে ভারতকে গোলাবর্ষণ বন্ধ করার আর্জি জানানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণে পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দিয়েছে ভারত। তার ফলেই সংঘর্ষ বিরতি মেনে চলতে এখন পাকিস্তান কাতর আর্জি জানাচ্ছে।' অন্যদিকে রমজান মাসে জম্মু-কাশ্মীরে সেনা অভিযান বন্ধ রাখার বিষয়ে কেন্দ্র সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার ফলে কাশ্মীরে সবার উপরেই একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলে জানিয়েছেন ওই রাজ্যের পুলিশের ডিজি এসপি বৈদ। পাকিস্তানি হামলার জবাবে ভারত যে এই প্রথম পাল্টা মার দিল— ব্যাপারটা এমন নয়। এর আগে ২০১৬ সালে সার্জিকাল স্ট্রাইক করে পাক ভূখণ্ডে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল ভারত। সে সময় গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে একাধিক জঙ্গি ঘাঁটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। এম-১৭ হেলিকপ্টারে করে ১৫০ জন কমান্ডোকে নামিয়ে দেওয়া হয় পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। তারাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তিন কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে জঙ্গিদের সাতটি লঞ্চ প্যাডে হামলা চালায়। ওই অভিযানে মৃত্যু হয় অন্তত ৩৮ জন জঙ্গি ও দুই পাক সেনার। ড্রোন ব্যবহার করে গোটা অভিযানের ছবি তুলে রাখে সেনাবাহিনী। শুধু সার্জিকাল স্ট্রাইক নয়, এ বছরের গোড়ার দিকেও পাকিস্তানের ওপর পাল্টা আঘাত হেনেছিল ভারতীয় সেনা। জম্মুর আর এস পুরা এবং আর্নিয়া সেক্টরে বিএসএফের পাল্টা হামলায় ধূলিসাৎ হয়ে যায় চারটি পাক সেনা চৌকি। খতম হয় ২০-২৫ জন পাক সেনা। এই অভিযানে ৮২ ও ৫২ এম এম মর্টার বোমা এবং স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ভারতীয় সেনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান আবার নতুন করে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করায় পরিস্থিতি অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী জরুরি বৈঠক ডেকেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই জানা যাবে।

কংগ্রেসের জালিয়াতি ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিজেপিকে বিধানসভায় নিজেদের শক্তি প্রমাণ করতে হবে। আদালতের এই রায় ঘোষণার প্রেক্ষিতে

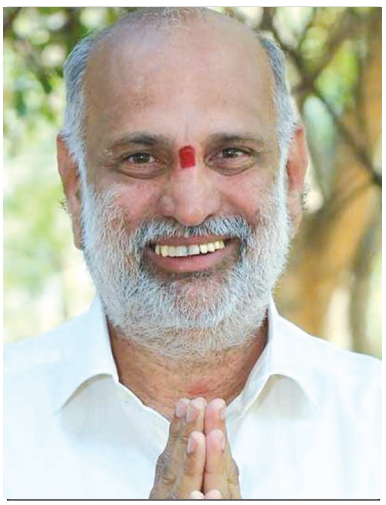

শিবরাম হেব্বর

ছিল কংগ্রেসের দাখিল করা একটি অডিও টেপ। যাতে শোনা গিয়েছিল কর্ণাটকের বিজেপি নেতারা অর্থের বিনিময়ে কংগ্রেস বিধায়ক শিবরাম হেব্বরের স্ত্রীকে দল ভাঙার জন্য টাকার টোপ দিচ্ছেন। বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির সভাপতি অমিত শাহ আগেই টেপটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সম্প্রতি কংগ্রেসের সেই বিধায়ক শিবরাম হেব্বর টেপটি ভুয়ো বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এবং তাঁর স্ত্রীর কাছে এমন কোনও ফোন আসেনি বলেও তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। তাই কর্ণাটকে সরকার গড়ার আগেই কংগ্রেস বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছে। চাপ উত্তরোত্তর বাড়ছে, কারণ এই বিধানসভা নির্বাচনেই কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে শিবরাম জিতেছেন। উল্লেখ্য, কংগ্রেস-জেডিএস জোটকে 'অপবিত্র' বলে বর্ণনা করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, জনাদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে জোট গড়া হয়েছে। মানুষ এই জোটকে মেনে নেবেন না। কর্ণাটকের মানুষ যে ক্ষুব্ধ তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

॥ওঁ॥

সুন্দরবনে নির্মীয়মাণ কন্যা ছাত্রীনিবাস এবং কল্যাণ
আশ্রমের সেবাকাজের বিস্তার কল্পে
পুরুষোত্তম মাসের পবিত্র অবসরে

।। রাম কথা ।।

এবং ১০৮ মানস পাঠের আয়োজন

স্থান :

দি স্টেডেল

যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন, সল্টলেক স্টেডিয়াম, কলকাতা - ৯৮

তারিখ : ১৯ মে শনিবার থেকে ২৭ মে রবিবার পর্যন্ত

সময় : দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

কথাকার :
বিদুষী কুমারী বিজয়া উর্মিলিয়া

তু-ম্যায় এক রক্ত

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম
কলকাতা - হাওড়া মহানগর

বারাণসীর অলিগলিতে লুপ্ত গঙ্গার খোঁজে আই আই টি-র গবেষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রায় ১ বছর হয়ে গেল আই আই টি খড়্গপুরের প্রযুক্তিবিদরা বারাণসীর প্রাচীনতম অংশের অলি-গলিতে ঘুরে ফিরছেন লুক্কায়িত মণি-মাণিক্যের সন্ধানে। এত দিনে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে হাজার বছর আগে স্রোতস্বিনী গঙ্গা বারাণসী শহরের মধ্যে দিয়েই বয়ে চলত। আর এর মধ্যেই লুপ্ত হয়ে আছে বারাণসীর স্মার্ট সিটি হয়ে ওঠার গোপন রহস্য।

প্রধানমন্ত্রী মোদী স্বয়ং প্রতিনিয়ত সমীক্ষার অগ্রগতির ওপর নজর রাখছেন। আর সমীক্ষক দলও নিয়ম করে পিএমও-তে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে।

এই মহাগুরুত্বপূর্ণ সন্ধান কর্মে আই আই টি-র সঙ্গী হয়েছে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও বারাণসী পৌর নিগম। সন্ধানকারীদের মূল লক্ষ্য গঙ্গার পুরনো গতিপথটি পুনরাবিষ্কার করা ও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার অংশ বিশেষকে আবার প্রবহমান করে তোলা যায় কিনা তা বিবেচনা করা, কেননা অতীত বারাণসী একটি নদীকেন্দ্রিক পরিবেশকে ঘিরেই বেড়ে উঠেছিল। যে প্রণালীগুলির মাধ্যমে তদানীন্তন শহরে জল সরবরাহ হতো গবেষক দলটি সেগুলিকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করতে পেরেছেন। আশ্চর্যের কথা, ভূগর্ভস্থ সেই জলবাহী প্রণালীগুলি এখনও কিছুটা সক্রিয় রয়েছে। জায়গায় জায়গায় এগুলিকে চালু করার ব্যবস্থা (যা করা সম্ভব) হলে শহরের জল সমস্যা শুধু নয়, নিকাশি ব্যবস্থারও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান হতে পারে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে 'সন্ধি' শীর্ষক যে প্রকল্প এই সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর ও সংস্কৃতি মন্ত্রক যৌথভাবে হাতে নিয়েছে এটি তারই অংশ। আই আই টি-র স্থাপত্য ও নগর বাস্তুকার বিভাগও এই কাজে যৌথ ভাবে যোগদান করছে। এই সূত্রে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপত্য বিভাগের প্রধান জয় সেন বলেন, বেদের সময়কার ১৬টি শ্রেষ্ঠ মহাজনপদের অন্যতম ছিল ছিল বারাণসী। পরবর্তী জৈন ও বৌদ্ধ যুগেও এ শহর ছিল ঝলমলে এক মহানগরী। এই দীর্ঘ সময় ধরে বারাণসী বাণিজ্য ও অর্থনীতির অন্যতম সেরা কেন্দ্র ছিল। এখানে প্রবেশ ও নির্গমনের অন্যতম মাধ্যম ছিল গঙ্গা।

বিভিন্ন অনুসন্ধান ও খননকার্য পরিচালনার পর দলটি নিশ্চিত হয়েছে যে গঙ্গা গতিমুখ পরিবর্তন করলেও তা এখনও অন্তঃসলিলা। কিছু প্রযুক্তিগত প্রয়োগের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলকে সহজেই পানীয় করে তোলা যেতে পারে। শুধু তাই নয় হ্যান্ডলুম ও হস্তশিল্প যা বারাণসীর অর্থনীতির স্তম্ভ, সেইসব কাজের জলের প্রয়োজনও সহজেই মিটতে পারে।

গবেষক দলের তরফে জানানো হয়েছে শহরটি একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত জল সরবরাহ পদ্ধতির ঠিক ওপরেই অবস্থান করছে যা বহু শতাব্দী থেকে অব্যবহারে জীর্ণ। সহযোগী গবেষকদের সঙ্গে মিলে কীভাবে জলস্তরের ওপরের জীবনযাত্রাকে ব্যাহত না করে এই বিপুল সম্ভারকে বারাণসীর মানুষের কাজে লাগানো যায় তার দ্রুত ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে— জানান মুখ্য নিয়ামক জয় সেন।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও গিলগিট-বাল্টিস্তানে আর্থিক ক্ষমতা বাড়িয়ে নজর ঘোরানোর চেষ্টা পাক-প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে আরও বেশি আর্থিক ক্ষমতা দিতে চলেছে পাকপ্রশাসন। শুধু পাক-অধিকৃত কাশ্মীরই নয়, গিলগিট-বালটিস্তানকেও এই ক্ষমতা দিতে চলেছে তারা। প্রসঙ্গত, এই অঞ্চলের ওপরই বহু বিতর্কিত ৫০ বিলিয়ন ডলারের চীন- পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর গিয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠকে পাক-প্রশাসন ও পাক-সেনার গুরুত্বপূর্ণ কর্তা-ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাতে এই সিদ্ধান্ত হয়। কাশ্মীর ও গিলগিট-বালটিস্তান বিষয়ক পাক-যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সরতাজ আজিজ গত ১৯ মে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পুনর্গঠন পরিকল্পনা বিষয়ে ওই কথা জানান। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন খোদ পাক-প্রধানমন্ত্রী শাহিদ খান আব্বাসি।

যদিও বিশেষজ্ঞরা একে কেবল আর্থিক পরিকল্পনা হিসাবে মানতে চাইছেন না। তাঁদের মতে ওই দুই অঞ্চলেই ভারতের জুজু দেখছে পাকিস্তান। বিশেষ করে গিলগিট-বালটিস্তানকে পাকিস্তানে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক সত্তা হিসাবে গণ্য করা হয়। পাকিস্তানে চারটি প্রদেশ, যথা বালুচিস্তান, খাইবার-পাখতুনখাওয়া, পঞ্জাব ও সিন্ধু। এই অঞ্চলগুলিতে নির্বিচারে হিন্দু-নিধন হলেও হিন্দু-সংস্কৃতির নিদর্শন আজও বহমান। এই অবস্থায় পাক-সেনা যে সমস্ত অঞ্চলে বেকায়দায় আছে যেমন পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ও গিলগিট-বালটিস্তানে আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের মতো সুযোগ সুবিধা দিয়ে তা পুরোদস্তুর কবজা করাই পাক-প্রশাসনের লক্ষ্য। অতি সম্প্রতি ভারতের পাক-দালালদের দিয়ে সংঘর্ষ-বিরতির আবেদন জানিয়ে ও সেই সুযোগে নিজেরা তা লঙ্ঘন করায় ভারতীয় সেনার হাতে বেধড়ক মার খেয়ে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হয়েছিল পাকিস্তানের। মারের জ্বালা ভুলতে ভারত ১৯৬০ সালের সিন্ধু জল চুক্তি লঙ্ঘন করছে বলে কাঁদুনি গাইতে ওয়াশিংটনে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরে লোক পাঠিয়েছে পাকিস্তান। অন্যদিকে, ভারত বিরোধিতায় শান দিতে পাক-অথিকৃত কাশ্মীর ও গিলগিট- বালটিস্তানে বাড়াচ্ছে আর্থিক ক্ষমতাও। আর ভারতে পাক-গুণগ্রাহীরা মসনদ দখলের স্বপ্নে বিভোর। এই সবকটি ষড়যন্ত্রকে পাল্টা জবাব দিতে ভারতের প্রতিরক্ষা-বিদেশ-স্বরাষ্ট্র দপ্তর তৈরি বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

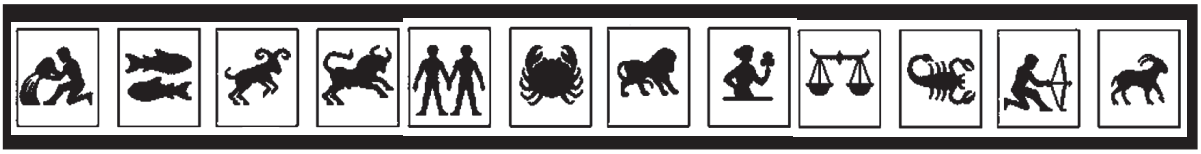

২৮ মে (সোমবার) থেকে ৩ জুন (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে বৃষে রবি-বুধ, মিথুনে শুক্র, কর্কটে রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল এবং কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র তুলায় বিশাখা থেকে মকরে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে।

মেষ : পারিবারিক সচ্ছলতা ও স্বস্তির একমাত্র উপায় কায়িক শ্রম। সন্তানের সাফল্য, কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্তি শুভ। পরিকল্পনায় সার্থক রূপায়ণ। জ্ঞান, বিদ্যা, শৌখিনতা, আভিজাত্য তথা বহুমুখী সফল প্রয়াস। গুণীজনের সান্নিধ্যে প্রতিভার প্রকাশ ও মান্যতা। গৃহে শুভ অনুষ্ঠান, কথা-বার্তায় শান্ত-সংযত থাকুন।

বৃষ : ব্যস্ততায় ক্লান্তিবোধ। গৃহসুখ ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে গুরুজনের কার্যকরী পরামর্শ। চর্ম, অস্থি, দাঁতের চিকিৎসায় যত্নবান হোন। ফাটকায় প্রাপ্তি। খেলাধুলায় উন্নতি। নতুন উদ্ভাবনী শক্তির স্ফুরণ তথা বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ। কবি, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞের সার্থক প্রয়াস। অর্থাৎ প্রত্যয়দীপ্ত পথ চলা। ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান।

মিথুন : চলা ফেরায় দুর্জন প্রতিবেশী থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। নতুন সংবাদে উৎসাহ, উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাস। কর্মক্ষেত্রে কারও বিসদৃশ আচরণে মনকষ্ট। বিদ্যা, বাহন, ব্যবসা, বিলাসিতায় ও চিন্তার স্বচ্ছতায় উৎকর্ষ ও সম্মান। শরীর, স্বাস্থ্য, গুরুজন, স্নেহভাজন সকলের প্রত্যাশা পূরণ। স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। অংশীদারি ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি।

কর্কট : সন্তানের কারণে মানসিক উদ্বেগ। অস্বস্তিকর পরিবেশ, তবে স্ত্রী ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। অনুকূল পরিবেশে চেষ্টা, যত্ন ও চিন্তার বাস্তবায়ন। অহেতুক বদনাম ও ঝামেলার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা। জ্যোতিষী ও জাদুকরের ক্ষেত্রে শুভ। গৃহ ও বাহন যোগ।

সিংহ : অপ্রত্যাশিত শুভ। অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে সাফল্যের পূর্ণতা। ছলনাময়ীর অবদানে পারিবারিক সুস্থিতিতে বিঘ্ন। বিদ্যার্থী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ব্যায়াম, কুস্তিগীরদের সাফল্য। মাতার স্বাস্থ্যের অবনতি। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

কন্যা : কীটপতঙ্গ থেকে সতর্ক থাকুন। নতুন ব্যবসায় সাফল্য। দান-ধ্যান, গুরুজনের আশীর্বাদ। তবে বয়স্ক বন্ধু শিরঃপীড়ার কারণ। শিল্প-সংস্কৃতি, হিসাবশাস্ত্র, ইলেকট্রনিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল প্রয়াস। অর্থাগমের দিকগুলি নব আলোকে উন্মোচিত হবে। বিবাদ-বিতর্ক ও ছদ্মবেশী প্রতিবেশীর সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। ব্যয়াধিক্য যোগ।

তুলা : প্রেম পর্যায়ে চাতকের দৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। উচ্চশিক্ষা ও কর্মে সাফল্য, ব্যবসায় সদর্থক, নব নিয়োগ ও বহুমুখী দিগন্তের দ্বারোদ্ঘাটন। সামাজিকতার সফল প্রয়াস। স্ত্রী/সন্তানের কারণে গর্ববোধ। ইতিবাচক পরিবর্তনে অবাক হতে পারেন।

বৃশ্চিক : আদর্শগত বিরোধিতার আপোস। ন্যায্য প্রাপ্তিতে সহকর্মীদের ঈর্ষা। কর্মে সংস্থাগত পরিবর্তন। খনিজ এবং পরিবহণ ব্যবসায় শুভ। বিদ্যার্থী, কর্মপ্রার্থীর মনস্কামনা পূরণ। সৃষ্টির উল্লাস। ব্যয়, সততা ও সরলতায়, আভিজাত্য গৌরব। বৈষয়িক সমৃদ্ধি, পারিবারিক স্বস্তি।

ধনু : মান-সম্মানের ক্ষেত্রে শুভ নয়। বিতর্ক কৌশলে এড়িয়ে চলা সুখকর। পরিজন সান্নিধ্য শ্রী ও সম্পদ লাভ। গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শিতা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, যোগধর্ম চর্চায় সম্ভ্রম ও কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। প্রতিবেশী-সহ সমান প্রগতিমূলক কর্মে রোমান্স ও সৃষ্টির আনন্দ। পিতার বৈষয়িক সমৃদ্ধি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। গৃহসুখ।

মকর : বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি বিষয়ে সফল প্রয়াস। দুর্জনের সঙ্গত্যাগ বাঞ্ছনীয়। শিল্পী-কলাকুশলী ও বিদ্যার্থীর বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ও মান্যতা প্রাপ্তি। ব্যবসায়ী, দালালি, প্রমোটারি-পুলিশ-খেলোয়াড়-নেতা-নেত্রীর প্রত্যাশিত প্রাপ্তি। আত্মীয়ের কু-প্রভাবে মানসিক চঞ্চলতা, বিশিষ্টজনের সান্নিধ্য।

কুম্ভ : গৃহসুখ বজায় রাখুন। শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ। কর্মে অতিরিক্ত দায়িত্ব। পূর্ণিমার জ্যোস্নালোকিত রাত্রির ন্যায় জ্ঞানের স্ফুরণ ও প্রতিভার উজ্জ্বল বিচ্ছুরণ। অংশীদারি ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের সন্ধান না করাই ভাল।

মীন : কুটুম্বিতা ও বান্ধব সমাগম। সেবামূলক অনুষ্ঠানে সদর্থক আলোচনায় অংশগ্রহণ। গৃহসুখ বজায় রাখুন। বিদ্যার্থী, গবেষক, প্রকাশক, অধ্যাপকের বিচিত্র সৃষ্টি ও মান্যতা। অস্থি-চর্ম রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন। উচ্চাভিলাষী না হওয়াই শ্রেয়।

• ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

শ্রী আচার্য্য